ISSN 1605-2021
লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা
জুন ২০০২, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

13-3-05

লোক-প্রশাসন সাময়িকী

প্রশিক্ষণ

ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০২/ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯

BPATC LIBRARY
JOURNAL SECTION
Date
SAVAR DHAKA

সম্পাদনা পরিষদ
ড. এম মতিউর রহমান
সৈয়দ শামসুল আলম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রশান্ত কুমার রায়
মোঃ শফিকুল হক

সম্পাদক
কাজী হাসান ইমাম

লোক প্রশাসন সাময়িকী

ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০২/ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯
প্রকৃত প্রকাশকাল অক্টোবর ২০০৪/ কার্তিক ১৪১১

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ কাজী হাসান ইমাম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৯

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@sdnbd.org
ওয়েব সাইট	ঃ	http:/www.bpatc.org
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কে, এম, রুহুল মুনির
মূল্য	ঃ	১৮০ টাকা
		US $ 10

মুদ্রণে	ঃ	**কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস**
		৮০/৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০
		ফোন ঃ ৭১২০৮৮৮; ৭১১৮৭৫৯

LOK PROSHASON SAMOEEKY
Vol. 23, June 2002/Joishtho-1409
Actual Time of Publication : Oct. 2004/ Kartik 1411

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : Kazi Hasan Imam

@ Bangladesh Public Administration Training Centre 2002

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@sdnbd.org
Web site	:	http:/www.bpatc.org
BPATC Library	:	351.0005
Price	:	Tk. 180
		US $ 10

লোক-প্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

পঞ্চম প্রজন্মের এনজিও ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১
ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু
এস. এম. মনিরুল হাসান

জেন্ডার ধারণা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ১৯
কাজী হাসান ইমাম

বাংলাদেশ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস ঃ একটি মতামত ভিত্তিক পর্যালোচনা ৫১

রায়হানা আখতার জাহান
ড. রেজা হাসান মাহমুদ

ঝিনাইদহ্ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা ঃ একটি সমীক্ষা ৬১
মোহাম্মদ সেলিম
মোঃ জুলফিকার হোসেন

Loss Reducing Mechanisms of the Reverbank Erosion Displacees in Bangladesh : A Case of Environmental Disaster ৮৩

M. Zulfiquar Ali Islam

Cadastre Information System : An Urgent Need in Bangladesh ১০১

Byomkesh Talukder

ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা
জুন-২০০২/ জ্যৈষ্ঠ-১৪০৯

পঞ্চম প্রজন্মের এনজিও ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু *
এস. এম. মনিরুল হাসান **

Abstract : The traditional roles of NGO, in the developmental discourse, have been heading toward a new direction. The authors of this paper believe that the new international world order through free economic activities pave the way for NGOs to take new role in in the present day world. This paper argues that the new economic role of NGOs has been undermining the political existence of state. Consequently, creating new economic dependencies for the third world contries.

ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (জি.ও) পাশাপাশি এনজিওগুলো সেখানকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন প্রত্যয় দুটি এনজিও ধারণার সমার্থক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, রাষ্ট্রের চাইতে এনজিওগুলোই বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস.) এর মতে, (১৯৯০) এনজিওগুলো ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চেতনাবৃদ্ধি, ট্রেনিং বিভিন্নভাবেই দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখছে। হোসাইন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এনজিও হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দিয়ে ঋণ প্রাপ্ত লোকদের আয় ৩৩% বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল (Hossain 1994)। আলম তাঁর আরেকটি সমীক্ষায় (Alam 1989) দেখান যে, শুধু গ্রামীণ ব্যাংকই নয় অন্যান্য এনজিও চালিত প্রকল্পও পরিবারের আয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। মাসুম তাঁর গবেষণাতে একই ধারণা পোষণ করে বলেন যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়ে বাংলাদেশের অনেক পরিবারই তাদের নিজস্ব কল্যাণ সাধন করতে সমর্থ হয়েছিল। ইসলাম (১৯৯৭) তাঁর প্রবন্ধে এনজিওদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রত্যয় দুটির সাথে এনজিও প্রত্যয়টি ইতিবাচক ও সমাজের জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে সর্বমহলেই স্বীকৃত হয়েছে। এনজিওরা নিজেরাও একই ধারণা পোষণ করেন বরং তাঁরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই ভাবা শুরু করেছেন যে, (Saifullah 2001) তারা ছাড়া সমাজের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন একেবারেই অসম্ভব।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
** সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অন্যদিকে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করে এনজিওরা আদৌ বাংলাদেশের মত দেশগুলোর উন্নয়ন কতটুকু ঘটাতে পারছে সে বিষয়েও অনেক পণ্ডিত তাঁদের লেখায় সন্দেহ পোষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানের অনেক গবেষক, তাঁদের অতি সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে বরং দেখিয়েছেন যে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে এনজিওরা বরং দারিদ্র্য সংরক্ষণ করছে (Scholz, 2000)। Petras তাঁর "NGOs: In the Service of Imperialism" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে এই বলতে দ্বিধা করেন নি যে, উন্নয়নের ও দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওরা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করছে। এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করছে যে সমাজগুলো বিনা শক্তি প্রয়োগে উন্নত বিশ্বের তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করবে, তাদের উৎপাদিত পন্যের বাজারকে বিস্তৃত করবে তথা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে উন্নত বিশ্বের কাছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ নতুনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। Petras এর ভাষায় এনজিওরা এমন একটি সমাজের সৃষ্টি করবে যে সমাজের মানুষেরা না হবে প্রতিবাদী, না হবে প্রতিক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের এই নতুন শতাব্দীতে নতুনভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষণের জন্য উপরোক্ত প্রতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল এর মাঝামাঝি স্বভাবের মানুষের প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিওরা এই কাজগুলোই করে যাচ্ছে তথাকথিত উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের আড়ালে। অন্যদিকে এনজিওদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে Tvedt বলেন যে তারা আসলে ক্ষমতায়ন অথবা দারিদ্র্য দূরীকরণ করছে না, পরিবর্তে তারা এক ধরনের ব্যবসা করছে যা শুধু তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য ভাগ্য খুলে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, Many NGOs do not have any mission, except for one- they are in it for business (Tvedt 1998: 215)। Riddle Ges Robinson-এর মতে যদিও এনজিওরা এসেছে সাধারণ মানুষ তথা গরীব লোকদের উন্নতি ঘটাতে এবং সর্বোপরি সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে, তথাপি এনজিওদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তা কতটুকু করা সম্ভব সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে (Riddle & Robinson 1993)। পল আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এনজিওরা তাদের লক্ষ্য দরিদ্রতমদের সাহায্য করার বদলে অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্রদেরকেই কিছু সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে (Paul 1995)। অবশ্য এনজিওরা যে তাই-ই করবে, এটাই যে তাদের প্রকৃত অদৃশ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পরিপূরক, এই বিষয়টিই বোঝা যাবে আমরা যদি গভীর ভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবি। Hulme এবং Mosley-র (১৯৯৬) লেখাতেও এই একই কথার প্রতিফলন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ তাঁরাও গবেষণার মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছেন যে এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের নামে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশকে বাদ দিয়ে বরং অপোকৃত কম ও মাঝারী দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নেই বেশী মনোযোগী। যদিও

এনজিওদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডটি শুরু হয়েছিল সমাজের দরিদ্রতমদের দারিদ্র্য দুর করার অঙ্গীকার নিয়ে (Saifullah 2001)। অথচ দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে বরং সহনীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য টিকিয়ে রাখাই তাদের কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য হিসেবে আবির্ভূত হল। এখন প্রশ্ন হলো কেন এনজিওরা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই প্রবন্ধে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবুও বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করব এ কারণে যে এনজিওরা তাদের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিচালনা করবে তা বুঝতে এ প্রশ্নের উত্তর অনেক সহায়ক হবে। অর্থাৎ পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) পরিস্থিতিতে নিকট ও দূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের মত তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই এই এনজিওদের ভূমিকা ও স্বরূপ কি হবে, এই বিষয়টি অনুসন্ধানই হবে বর্তমান প্রবেন্ধর মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা আমাদের আলোচনাগুলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। এনজিওদের স্বরূপ অন্বেষণে তথা রাষ্ট্র ও এনজিওদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করার আগে আমাদের দেখা প্রয়োজন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও কি চরিত্র নিয়ে এনজিওসমূহ আমাদের মত দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। Petras (1999) তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এনজিওরা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সপক্ষে কাজ করছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল করার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় এনজিওরা অগ্রসর হচ্ছে একদিকে বামপন্থী আন্দোলন (Petras 1999) কে নস্যাৎ করার মাধ্যমে, অন্যদিকে একটি নব্য Comprador শ্রেণী সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এনজিওরা-কি শুরু থেকেই এ চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল? এই প্রশ্নকে সমান রেখেই এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে।

এনজিও কার্যক্রমের পটভূমি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা পায় বাংলাদেশ। নয় মাস ব্যাপী যুদ্ধে এই নব্য স্বাধীন দেশটি সার্বিক ভাবেই বিধ্বস্ত-দেশ হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই দেশটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম এনজিওদের আগমন ঘটে এই দেশে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠন এবং মানবতার প্রতি সাহায্য এই মানসিকতা নিয়েই জাতিসংঘ মিশন সর্বপ্রথম আসে এই দেশটিতে। যার পূর্ণাঙ্গ নাম ছিল United Nations Relief Operation in Dacca (UNROD)। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে সাথেই আরো কিছু এনজিও একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশে (Dhar 1997)। অবশ্য কিছু কিছু এনজিও তারও অল্প কিছু আগেই এই ভূমিতে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। বিশেষ করে ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণাঞ্চলের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল সেই ক্ষতির পুনর্গঠনের ইচ্ছাতেই কিছু কিছু

এনজিও তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এদেশে। BRAC নামক বর্তমানের বিশাল এনজিওটির যাত্রা শুরু হয়েছিল এভাবেই। অর্থাৎ ১৯৭০ এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিকে সামনে রেখেই এনজিও সংগঠনগুলো মানবতার পক্ষে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল বাংলাদেশের মাটিতে।

এখন দেখতে হবে কোন কারণে এনজিওগুলো ঠিক এ সময়েই তাদের কার্যক্রম শুরু করল। এটা ঠিক যে নৈতিকতার ও মানবতার প্রতি মানুষের যে অপরিসীম দায়বদ্ধতা রয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের প্রতি এনজিওদের মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আদৌ কি মানবতাবাদী চেতনাই এনজিওদের সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল নাকি এর পেছনে আরো কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য রয়েছে। Petras (1999), Saifullah (2001), Elsenhans (1997), Smillie (1995), সেন (১৯৯৯) প্রমুখ এবং আরো অনেকেই মনে করেছেন যে মানবতাবাদী চেতনার আড়ালে আরো কোন পরোক্ষ কারণ রয়েছে এনজিও নামক সামাজিক সংগঠন বিকাশের পেছনে। Petras এর ভাষায় উন্নত দেশগুলো (যেমনঃ আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান প্রমুখ) অনুন্নত দেশগুলোতে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে নির্ভরশীলতার বিকাশ এবং কার্যক্রমের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৩) তাঁর "বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি" এই শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলেছেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশসমূহকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী মোড়কে নির্ভরশীল করে রাখার মানসিকতা নিয়েই বিশ্বে সামাজিক সংগঠনের ধারণার জন্ম দেয়। Douglas (1987) এর মতে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা অতি-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র যন্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে স্বেচ্ছায় অন্যের উপকার করার যে মানবিক প্রকৃতি, সেটি আধুনিক সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, সুন্দর মানবিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন স্বেচ্ছায় পরোপকারের মত মানবিক গুণাবলীর। যেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রে তা হারিয়ে গেছে সেজন্যই তার স্থান পূরণ করতেই জন্ম হয়েছে এনজিও সংগঠনের। Hensman (1994) একটু ভিন্নভাবে এনজিও সংগঠনের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন—তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্রই যে কোন সমাজের সদস্যদের সমষ্টিগত সম্পদ (Public good) বিতরণের ভার নেয়। এখানে সমষ্টিগত সম্পদ বলতে শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রকে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়াস পায়। অন্যদিকে রাষ্ট্র ছাড়াও কোন সমাজের সমষ্টিগত সম্পদ (Public good) বিতরণের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সেই সমাজের বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। অনেক সময়ই বাজার ব্যবস্থা প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় সমষ্টিগত

সম্পদ (Public good) বিতরণ করতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিফলতা ও বাজার ব্যবস্থার অকার্যকরতা এই দুটি অবস্থার কারণেই, Hensman মনে করেন, এনজিও ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। Smillie (1994) অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, বাজার ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণেই যদি এনজিওদের বিকাশ ঘটত তাহলে পৃথিবীতে অনেক ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলোতে অনেক আগেই এনজিওদের অনুপ্রবেশ ঘটত। বরং তাঁর মতে আধুনিক সমাজের সে সমস্ত জায়গাতেই এনজিওদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যেখানে মানুষের পরোপকার অথবা স্বেচ্ছা পরোপকার করার মানসিকতা হ্রাস পেয়েছে অথবা লোপ পেয়েছে। Saifullah (২০০১) অবশ্য এই যুক্তিকে খণ্ডন করে বলেন যে যদি স্বেচ্ছা পরোপকারের অভাবের কারণেই এনজিওদের বিকাশ ঘটত, তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশে, যেখানে পরোপকারের ব্যাপক দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং সংগঠন আকারেও যার অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে ব্যাপক এনজিওদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে কেন। অন্যদিকে Eelsenhans আরেকটু ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত অঞ্চলের সরকার তাদের জনগণের দারিদ্র্য দূরিকরণে ব্যর্থ হয়েছে, সে সমস্ত অঞ্চলেই কেবল এনজিওদের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

নব্য উদারনীতি দর্শন

যদিও এতক্ষণ এনজিওদের উদ্ভবের একটি বিস্তারিত এবং বহুমুখী ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তথাপি এর বাইরে আরো কোন কারণ কি পরোক্ষভাবে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে না? এটা ঠিক যে রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতা, পরোপকার প্রবণতার অভাব অথবা প্রচলিত বাজার কাঠামোর ব্যর্থতা এনজিওদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু এ সবগুলো যুক্তির বিপক্ষে প্রতিযুক্তিও কম উপস্থাপিত হয়নি। অনেক উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞানীও (Korten 1990; Clark 1991) এ বিষয়ে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা মনে করেন বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এই বিষয়টিকে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। নব্য-উদারনীতিবাদী চেতনায় বিশ্বাসী বর্তমান বিশ্ব এখন বিশ্বসমাজ (Globalization Society) বিনির্মাণে সচেষ্ট। এই বিশ্বায়িত সমাজে কেউই আলাদাভাবে বসবাস করতে পারবে না। সুতরাং বিশ্বায়িত সমাজে সমন্বিতভাবে বসবাস করতে হলে একটি একক সমন্বিত অর্থনৈতিক বাজার ব্যবস্থারও প্রয়োজন। ধরে নেয়া হয় যে এই সমন্বিত একক বিশ্ববাজার ব্যবস্থা দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সমর্থ হবে। অনুন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্রকাঠামো যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, নব্য উদারনীতিবাদী দর্শনে প্রভাবিত বিশ্ব বাজার ব্যবস্থা তাই-ই করতে সফল হবে অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরিকরণে সফলকাম হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত বিশ্ব সংগঠনসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এই সমস্ত বিশ্ব সংগঠনসমূহের

সুপারিশের ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকারবৃন্দ এনজিওদের তাদের স্ব স্ব দেশসমূহের দারিদ্র্য বিমোচনের সহযোগী অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করেছে (Takarala 2001)। সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা তথা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলছে আর তার স্থান গ্রহণ করছে এনজিওগুলো। এই পরিবর্তিত অবস্থার নিরিখেই প্রকৃত পক্ষে বিস্তার ঘটছে এনজিও নামক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের। আর এ সব কিছুর পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বর্তমান বিশ্বের নব্য-উদারনীতি দর্শন।

বাংলাদেশে এনজিওদের ব্যাপ্তি

এতক্ষণ আমরা এনজিওদের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। অলোচনার সময় মনে রাখতে হবে এই আলোচনা সাধারণভাবে সকল দেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। এই অংশে আমরা দেখার চেষ্টা করব এনজিওগুলোর ব্যাপ্তি বাংলাদেশের বেলায় কি রকম হয়েছিল। যদিও প্রাথমিকভাবে মানবিক সাহায্যকে উদ্দেশ্য করেই এনজিওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এদেশে, কিন্তু পরবর্তীকালে এর কার্যক্রমের পরিধি আর সেরকম থাকল না। এই বিষয়টিকে এনজিও বিশেষজ্ঞ David Korten চমৎকারভাবে তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এনজিওসমূহ অন্যান্য দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল সাময়িকভাবে বন্যা, মহামারি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মানুষকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে লক্ষ্য বদলে গিয়ে কার্যক্রম শুরু হল মানুষকে স্বনির্ভর করার মানসিকতা ও ক্ষমতা সৃষ্টির চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু যখন থেকে এনজিওরা অনুভব করল যে শুধুমাত্র সক্ষমতা অর্জনের দক্ষতা দিয়ে মানুষের উন্নতি সম্ভব নয় তখন থেকেই গ্রহণ করা শুরু হল নতুন কার্যক্রমের। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ কিভাবে মানুষের তথা সমাজের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব তা নিয়েই ভাবা শুরু করলেন এবং নতুন মাত্রার প্রকল্প প্রণয়নে তারা মনোযোগী হতে শুরু করলেন। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ তাদের প্রকল্পের পরিধি স্থানিক পর্যায় থেকে বদলে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্ধিত করতে শুরু করে এবং ক্রমাগতভাবে তাদের কার্যক্রমের সাথে সমাজের একটি অংশের সংযোগ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এনজিওগুলো এখানেই থেমে থাকল না। ক্রমান্বয়ে সমাজের মানুষগুলোর সাথে, যাদের সাথে এনজিওরা তাদের কার্যক্রম নিয়ে জড়িত, তাদের সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষার দিকে মনোযোগী হল। এ হচ্ছে David Korten এর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এনজিওদের কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা। এখন আমরা দেখব David Korten (1988) বিষয়টিকে কাঠামোগতভাবে কিভাবে তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ভেবে যে

তা আমাদের এই প্রবন্ধের মূল আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে। David Korten (1990) বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছেন যে কার্যক্রমের দিক থেকে এনজিওদেরকে চারটা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত: প্রথম প্রজন্ম এনজিও, দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় প্রজন্ম এনজিও, তৃতীয়ত: তৃতীয় প্রজন্ম এনজিও এবং চতুর্থত: চতুর্থ প্রজন্ম এনজিও। এখন আমরা দেখব যে বিভিন্ন পর্যায়ে এনজিওসমূহ কি ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

(ক) প্রথম প্রজন্ম এনজিও ঃ এই ধরনের এনজিও একেবারে প্রথমদিকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। মূলত গরীবদের প্রতি মানবিক সাহায্যের নিমিত্তেই প্রধানত তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ করে কোন প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘবের। এই বিষয়কে মাথায় রেখেই এনজিওরা ব্যক্তি অথবা পরিবারসমূহ, যারা বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদেরকে সাময়িকভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল। এনজিওরা ভেবেছিল যে সাময়িক দুর্দশা থেকে মুক্ত হলেই দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ নিজেদের ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আবার স্বচ্ছল ও স্থিতাবস্থায় ফিরে আসবে। বেশীর ভাগ বাংলাদেশী এনজিও (প্রথম প্রজন্ম এনজিও) তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ১৯৭৪ সালের প্রলয়ংকরী বন্যাকে কেন্দ্র করে। ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committee), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), প্রমুখ এনজিওদের যাত্রা শুরু এ সময়ই। এনজিওরা ভেবেছিল স্বল্পস্থায়ী সাহায্যের মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত মানুষের শক্তিকে কিছুটা ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের গরীব মানুষের জন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই প্রক্রিয়ায় সাহায্য।

(খ) দ্বিতীয় প্রজন্ম এনজিও ঃ উন্নয়ন প্রত্যয়টি এই পর্যায়ের এনজিওদের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। উন্নয়ন প্রত্যয়টি মাথায় রেখেই এ পর্যায়ের এনজিওরা তাদের প্রকল্পগুলো প্রণয়ন শুরু করল। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে উন্নয়ন করার চেতনাকে সৃষ্টি করা, স্বনির্ভর স্থানীয় সমাজ সংস্থাকে উৎসাহিত করা। এ পর্যায়ে এনজিওরা সমাজের উন্নয়নের প্রভাবক হিসেবে আবির্ভূত হল পূর্বের রিলিফ সাহায্যদাতার স্থলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্ম হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল এনজিওরা এ সময়ে কখনোই সমন্বিত কোন উন্নয়নের কথা ভাবতো না এবং সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া যে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় সে বিষয়টিও এ পর্যায়ের এনজিওসমূহ তাদের পরিকল্পনায় স্থান দেয়নি।

(গ) তৃতীয় প্রজন্ম এনজিও ঃ এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ তাদের পূর্বের কাজের অগ্রগতি ও ব্যর্থতাকে মনে রেখে তাদের কার্যক্রমকে স্থানীয় পর্যায়ে না রেখে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াস পায়। এ পর্যায়ে এনজিওসমূহ টেকসই উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে তাদের কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করা শুরু করলেন। টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা। আর এরই সূত্র ধরে তারা বিশাল বিশাল প্রকল্প প্রণয়নে মনোনিবেশ করলেন যাতে বিশাল জনসংখ্যার মানুষ চেতনাগতভাবে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। কারণ এই পরিবর্তনের চেতনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে একটি সমাজের কাঠামোগত তথা ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনের সূচনা ঘটানো।

(ঘ) চতুর্থ প্রজন্ম এনজিও ঃ এ পর্যায়ের এনজিওরা প্রাথমিক ভাবে অনুভব করতে শুরু করে যে মানুষকে কাঠামোগত পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে হলে আগে সাধারণ মানুষদের যারা ক্ষমতাহীন কিন্তু পরোক্ষভাবে ক্ষমতার স্রষ্টা, তাদেরকে সুসংগঠিত করতে হবে এবং এই সংগঠনের সূচনা ঘটবে পারস্পরিক সম্পর্কের বেড়াজালে (Network) আবদ্ধ হয়ে। এনজিওদের এই ধারাটিই বর্তমান সময়ের এনজিওসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছে। এনজিওদের কাজ হচ্ছে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় নিজেরাই চেতনাগতভাবে এগিয়ে আসে। এনজিওরা শুধু এই সম্পর্ক সৃষ্টিতে প্রভাবক হিসেবেই কাজ করবে এর বেশী কিছু নয়। এডাব (Association of the Development Agencies in Bengladesh), NGO Forum for Drinking Water, Credit and Development Forum, Coordination Council for Human Rights in Bangladesh প্রমুখ সংগঠনসমূহ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরী হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে David Korten এনজিওদের কর্মতৎপরতাকে যেভাবে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন ঠিক সেভাবে সুস্পষ্টভাবে সবগুলো এনজিওকে তাদের কর্মতৎপরতার উপর কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধাপে বা বর্তমানে চতুর্থ ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে দেখা যাবে না। কারণ এখনও বহু এনজিও তাদের কর্মতৎপরতায় কখনও শুধুমাত্র সাহায্য কেন্দ্রিক, কখনও বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কেন্দ্রিক কখনও বা দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়ন কেন্দ্রিক কখনও বা মিশ্র কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করেছে। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে David Korten এর ধাপগুলো এনজিওদের ক্রম পরিবর্তনশীলতাকে বুঝতে অনেকাংশে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এনজিওদের কর্মকাণ্ডসমূহ কি এই চতুর্থ ধাপেই শেষ হয়ে যাবে? নাকি রূপান্তরের ক্ষেত্রে অন্য কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে। মূলতঃ এই বিষয়টিই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকে বোঝার জন্যই আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনা অব্যাহত রাখব।

এনজিওদের কর্মপদ্ধতির পঞ্চম ধাপ

Korten যেখানে চতুর্থ ধাপের এনজিওদের নিয়ে তার আলোচনা শেষ করেছেন ঠিক সেখান থেকেই এই প্রবন্ধের মূল আলোচনা শুরু। বর্তমান পৃথিবী একটি নব্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে অচিরেই, আর সেই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মত দেশগুলো অবশ্যই নতুনভাবে পরিচালিত হতে বাধ্য। এই নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অধীনে বাংলাদেশের মত রাষ্ট্র ও এর জনসাধারণের কাঠামোগত ভূমিকা আদৌ কি বর্তমানের মত পরিচালিত হবে? এক্ষেত্রে এনজিওরা কি কোন নতুন আদলে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে? এই নতুন কার্যক্রমের ফলে সরকার তথা রাষ্ট্রের সাথে এনজিওদের সম্পর্কের পরিধি কিরকম হবে? একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আমরা কেন ভবিষ্যতের পৃথিবীকে একটি নব্য অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবর্তিত হবে বলে মনে করছি। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিকভাবে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী হবে একেবারেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত। মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতিতে ক্রমশ অনুপ্রবেশ করছে পৃথিবী। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী শুল্ক মুক্ত বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। বর্তমানে জাতি-রাষ্ট্রগুলোর স্ব স্ব সরকার তাঁদের সীমা রেখার মধ্যে শুল্কনীতি তৈরী ও পরিচালনা করেন। সরকার তাঁর স্বার্থকে সংরক্ষণ করার জন্য পণ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে শুল্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বাজার ব্যবস্থার উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে বাজার সর্বাঙ্গীনভাবে তার চরিত্রকে জাতিরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বাস্তবায়িত করতে পারে না। বর্তমানের জাতি রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তাদের অর্থনৈতিক তথা গোটা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখছে। কিন্তু যে মুহূর্তে বাজারকে জাতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের কোন রকম নিয়ন্ত্রণই যখন আর কার্যকর হবে না এবং এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্য যখন প্রয়োজনীয় বিশ্ব অর্থনৈতিক (Universal Institutions) প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি হবে (যেমনঃ GATT, WTO ইত্যাদি) ঠিক তখনই বাজার তার নিস্পৃহ নীতিগুলো কার্যকর করতে পারবে ভবিষ্যতের সমাজ ব্যবস্থায়। এই প্রক্রিয়াকেই বর্তমান প্রবন্ধে নব্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের এই পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এনজিওসমূহ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা সফলভাবে পালন করছে বলে বিশ্ব জনমতের কাছে ইতোমধ্যেই প্রতিভাত হয়েছে। Farrington এবং অন্যান্য সম্পাদিত (১৯৯৩) প্রবন্ধসমূহে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সাধারণ মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরং ব্যর্থই হয়েছে তাদের অদূরদর্শিতা ও দুর্নীতির কারণে। অন্যদিকে এনজিওসমূহ তাদের লক্ষ্য, উন্নত ব্যবস্থাপনা ও স্বল্প আকারের কারণে অতিসহজেই সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে তথা সাধারণ মানুষের

কথাকে উন্নয়নের ডিসকোর্সে স্থান দিয়েছে। বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবেই সাফল্যের দাবিদার। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অদূরদর্শী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকার তথা রাষ্ট্রের দরিদ্র্য দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসের চাইতে অন্তত এনজিওসমূহ কিছুটা হলেও আশার আলো ও উদ্দীপনা ছড়িয়েছে। বিষয়টি যতটা সরলভাবে দেখানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা কতটুকু সরল সে বিষয়টির একটি বস্তুগত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ 'রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এনজিওদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যজনক কর্মসম্পৃক্ততা সম্ভব'-- এই বিষয়টি অতিমাত্রায় সরলীকরণ করে দেখা হয়েছে বিভিন্ন একাডেমিক আলোচনায়। এনজিওদের যে একটি বিপরীত ও নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে তা স্পষ্ট হবে (Tvedt 1998; Saifullah 2001) প্রমুখদের লেখার মধ্য দিয়ে। এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকাকে সামনে রেখেই আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব একবিংশ শতকে এনজিওদের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত কি রকম হতে পারে। এই বিষয়টিকে উপস্থাপনের লক্ষ্যেই আমরা এই আলোচনা কতগুলি উপবিভাগে বিন্যস্ত করব। পঞ্চম স্তরে রাষ্ট্র ও এনজিওদের মধ্যকার সম্পর্কের রূপরেখা রাষ্ট্র এবং এনজিওসমূহের মধ্যে কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ইতোমধ্যেই একদিকে সহযোগিতা অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত কাজে সরকার সাফল্যজনকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছতে পারছে না এবং যেখানে সমাজের এলিট শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে না সেখানে সরকার খুবই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এনজিওদের সহযোগিতা করছে। অন্যদিকে যে সমস্ত কাজে সরকারের এবং সমাজের এলিট শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে সেখানে ক্রমাগতভাবেই সরকার ও এনজিওদের মাঝে একধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর পরিণতিতে সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের প্রতিযোগিতা (Farrington and Lewis 1993)। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন প্রয়াসী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ (Lewis 1993)। তবে একথা বললে ভুল হবে না যে, প্রথমদিকে এনজিও ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্র এনজিওদের খুব ভালভাবে সহায়তা করেছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন প্রকল্প, গণশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওরা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করছে। এক্ষেত্রে সরকারের মূল ভুমিকা হচ্ছে সহায়তাকারীর। ক্রমশই সরকারের এই সহায়তাকারী ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার ততদিনই এনজিওদের প্রতি সহায়তাকারীর ভূমিকা নিয়েছে যতদিন পর্যন্ত এনজিওরা সরকারের স্বার্থের প্রতি কোন রূপ হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি। যখন থেকে সরকার তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে হুমকির মত মনে করা শুরু করেছে তখন থেকেই নানাদিক দিয়েই এনজিওদেরকে নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে নিয়ে আসতে শুরু করেছে। ১৯৮৯ সালের দিকে বাংলাদেশে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সৃষ্টি করা হয় এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ

করে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্র খুব একটা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্র এখন শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রকল্পের ভেতরই এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে সীমিত করতে চাচ্ছে না, বরং যে বৈদেশিক ফান্ড এর উপর এনজিওরা প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল তা নিয়ন্ত্রণের জন্যও প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন প্রস্তুত করতে নিজেদেরকে মনোনিবেশ করেছে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই রাষ্ট্র তথা বাংলাদেশ সরকার এনজিওদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণের নিরিখে নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রায় চূড়ান্ত করেছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) এনজিওদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

(খ) এনজিওদের তাদের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ যেমনঃ বই ইত্যাদি সরকারের শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনকৃত হতে হবে।

(গ) দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের আগে সরকারের কাছ থেকে এনজিওদের অনুমতি নিতে হবে।

(ঘ) বিদেশি সাহায্য কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে বিষয়ে এনজিওদেরকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতে পারে।

(ঙ) ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করলে সরকার সেই এনজিওদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(চ) এনজিওদের কর্মকাণ্ডে স্থানীয় প্রশাসন যেমন (টি.এন.ও, জেলা প্রশাসক, চেয়ারম্যান) প্রমুখদের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

(ছ) সরকার এমন একটি নীতিমালা তৈরী করবে যার ভিত্তিতে এনজিওসমূহের বেতন, ভাতা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যায় এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে তা বাজেটের একটি নির্দিষ্ট হার অতিক্রম না করে।

(জ) এমন একটি নতুন আইন তৈরী করা হবে যার ভিত্তিতে স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওদের সম্পদকে ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে এনজিওদের সম্পত্তি স্থানান্তর বা বিক্রি করার জন্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পরবে। এনজিওদেরকে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব প্রতি বছর এনজিও বিষয়ক দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(প্রথম আলো, ২৩.০৯.২০০২)

সরকারের এনজিও বিষয়ক কমিটির উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সরকার সার্বিক দিক তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিচালনাগত সকল বিষয়েই এনজিওদেরকে নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজছে এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছে তখন পর্যন্ত জানা খবর অনুযায়ী এই

সুপারিশগুলো সরকারের মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে, অনুমোদিত হলে তা যাবে জাতীয় সংসদে এবং সেখান থেকে বিল আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনে পরিণত হবে। তবে বিলটি যাতে আইনে পরিণত হয় সে বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারকরা জনসমক্ষে বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ১৭ মাসে নয়টি সভা করে এনজিও সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি গত ২৪ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে এনজিও পরিচালনার জাতীয় নীতিমালা সংবলিত ১৩১ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করেছে। (প্রথম আলো, ২৩.০৪.২০০৩)। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এনজিওরা দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ব্যবসা করছে বলে মন্তব্য করেন এবং তিনি এনজিওদের বলেন-"If you want to do business trade in something else not people's poverty. The country needs to change a beggar's attitude because poverty cannot be eliminated with one or two thousand taka loan. He further said rather there is the need for industrialization and employment generation to eradicate poverty" (The Daily Star, 16.09.02)। সরকার তথা রাষ্ট্র বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়ায় এনজিওদের কর্মকাণ্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে এই যুক্তিতে যে, যে আদর্শের বা লক্ষ্যের কারণে এনজিওরা কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল তার বাইরেও তারা হস্তক্ষেপ করছে। রাষ্ট্র তার বর্তমান কাঠামোর আওতায় সহজেই এনজিওদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এটা সম্ভব কারণ একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে তা করা সম্ভব। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পরও এনজিওগুলো যে সহসাই তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের বিলোপ ঘটাবে অথবা রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ মেনে চলবে, এরকম সরাসরি উত্তর বোধ হয় এরকম প্রেক্ষাপটে আশা করা যায় না। রাষ্ট্র যেমন বর্তমান কাঠামো বজায় রাখবে, এনজিওসমূহও তাদের কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাটি কি রকম হবে তা নির্ধারণ করবে। সম্ভবত এই ভবিষ্যত কর্মপন্থাই পঞ্চম জেনারেশন এনজিওসমূহকে তার পূর্ববর্তী জেনারেশন এনজিওসমূহ হতে ভিন্নতর অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বর্তমান সময়ের এনজিওরা শুধুমাত্র সমাজকল্যাণমূলক কাজেই জড়িত নয়, তারা একই সময়ে আয় বাড়ানোর কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত। এই শেষের কর্মকাণ্ডটি তারা বর্তমানে করছে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। (ক) একদিকে নিজেদের (এনজিওসমূহ) অবস্থানকে আয় বাড়ানোর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা (যেমন সার্ভিস চার্জ বা সুদ গ্রহণের মাধ্যমে); অন্যদিকে (খ) গরীব মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানকে ঋণের উৎপাদনমুখী ব্যয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা (Saifullah 2001)। প্রথম কারণটির জন্য এনজিওরা প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং সেই উদ্বৃত্ত তারা ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা শুরু করেছে। ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, স্বাবলম্বি উন্নয়ন সমিতি (SUS) ইত্যাদি এনজিও ইতিমধ্যেই

সমাজে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভূমিকা পালন করছে। তারা আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক (যেমন-ইন্টারনেট সুবিধা, টেলি কম্যুনিকেশন) বিকল্প বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, ডেইরী ফার্ম, চেইন ষ্টোর (যেমন আড়ং), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, কৃষি ফার্ম ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে এনজিওসমূহের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড মোটেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারবে না, কারণ তারা তথাকথিত বেসিক শিল্পে এখনও মালিকানার হাত প্রসারিত করতে পারে নি। কিন্তু এই বিষয়টিইতেই আমরা জোর দিতে চাচ্ছি একটু ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এনজিও কার্যক্রম

একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রোপট বিংশ শতাব্দী থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন হতে বাধ্য। একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট। যেখানে দুটি বৃহৎ শক্তির নিরন্তর প্রতিযোগিতা ও তাকে নিয়ে শিবিরভুক্তির প্রবণতা এখন আর নেই। দুটি বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি একটি একক বিশ্ব স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখবে। রাজনৈতিকভাবে না হলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তা এক বিশ্ব বা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে মোটেও বাধাগ্রস্ত করবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে পাশ্চাত্যের একটি শক্তিশালী অংশে (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) এক মুদ্রার প্রচলনের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যেই বিশ্বের আঞ্চলিক জোটভুক্ত দেশগুলো (যেমনঃ ASEAN, SAARC, EU) একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশের পূর্বশর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টেরিফ উঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। GATT, WTO বিশ্ব সংস্থাগুলো একটি মুক্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠায় অনেক দূরই এগিয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই ২০০৫ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব একটি শুল্ক বাধামুক্ত বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য বিশ্বের প্রায় সবদেশই ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশও এই মুক্ত বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০০৫ সালের পর থেকে রাষ্ট্রীয় টেরিফ ব্যবস্থা আর কার্যকর থাকবে না। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকবে না বললেই চলে। প্রক্রিয়াটির শুরুতে হয়ত রাষ্ট্র সেভাবে তার কর্তৃত্ব নষ্ট না করতে চেষ্টা করবে কিন্তু প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে চলে যাবে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার উপর। মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় যার হাতে টাকা অর্থাৎ পুঁজি থাকবে সেই-ই বাজারকে তথা সামগ্রিক জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। পেটেন্ট ব্যবস্থার ফলে যার হাতে টাকা থাকবে সে দেশীয় বা বিদেশী যাই হোক না কেন সেই নির্দিষ্ট পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ পাবে। একচেটিয়া ব্যবসা শুধু মাত্র মূল্যের ক্ষেত্রে

সীমাবদ্ধ থাকবে না তার বিস্তৃতি ঘটবে পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন, সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও। এই বিষয়ে উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার কারণে পণ্যের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে পেটেন্টধারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তের অধিকারী হবে, রাষ্ট্রযন্ত্র নয়। কারণ রাষ্ট্র তার এই অধিকার ত্যাগ করেই আন্তর্জাতিক মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। এই অনিবার্য পরিণতির সাথে এনজিওদের ভূমিকার কি সম্পর্ক রয়েছে? একটু গভীরে চিন্তা করলেই বলা যাবে যে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ গ্রহণ করার যাবতীয় যোগ্যতা এনজিওরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। এই যোগ্যতার সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে আর্থিক উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করা। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় এনজিওই তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করছে। একটি বিশাল উদ্বৃত্ত এখন তাদের হাতের মুঠোয়।

এই বিশাল উদ্বৃত্ত তারা সম্ভবত পণ্যের পেটেন্ট করার মাধ্যমে ব্যয় করে আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার চেষ্টা করবে। যার প্রতিফলন ইতোমধ্যেই কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে ব্রাক এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। ফুরাদান একটি নির্দিষ্ট উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ। যার একমাত্র একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার রয়েছে ব্র্যাক নামক এনজিওটির হাতে। এভাবে যদি প্রতিটি এনজিওই তাদের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী মুক্ত বাণিজ্যের কল্যাণে পণ্যের পেটেন্ট করার মাধ্যমে ব্যবসাতে নিয়োজিত হয় (যা স্বভাবতই হবে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার কল্যাণে) তা হলে নিকট ভবিষ্যতেই এনজিওরা মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার কল্যাণে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবে। আর যদি এই বিষয়ে এনজিওরা সফল হয় তবে রাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়িই নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা থেকে আপোষকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের আপোষকারী ভূমিকা যে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য কতটুকু কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আপোষকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাষ্ট্র কি একটি নব্য কলোনিয়াল যুগে আত্মপ্রকাশ করবে না? আমরা তথা রাষ্ট্র ও সমাজকে পুনরায় শক্তিশালী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রকদের হাতে কি পরতে হবে না? এর ফলে কি সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হবার অবকাশ থাকবে না? এখন সময় এসেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার। এটা ঠিক, এনজিওরা আমাদের স্থানিক জীবন যাত্রার উন্নতিতে অনেক কার্যকর সাহায্য করছে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে এই সমস্ত এনজিওদেরকে কি আমাদের মত সমাজগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে না? এখানেই মনে হয় সকলের সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেয়া অধিকতর জরুরী।

উপসংহার

আমাদের উপরের আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বদৌলতে যে নতুন বিশ্বব্যবস্থায় আমরা পদার্পণ করতে যাচ্ছি সেখানে টিকে থাকার ও প্রভাবশালী ভূমিকা বজায় রাখার জন্য অনেক এনজিওই সক্ষমতা অর্জন করার পথে রয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বাংলাদেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বৃহৎ এনজিওসমূহের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্যের সামনে ছোট ছোট এনজিওগুলো টিকে থাকতে পারছে না। বাণিজ্যজগতে বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশন (MNC বা TNC) গুলোর সামনে টিকতে না পেরে যেমন ছোট কর্পোরেশনগুলো ক্রমশ একীভূত (Merge) হয়ে যাচ্ছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে ছোট এনজিওসমূহ হয় হারিয়ে যাবে অথবা বড় এনজিওগুলোর সাথে একীভূত হয়ে যাবে। এছাড়া কিছু কিছু সামাজিক খাতে সাফল্য লাভ করার কারণে রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে ঐসব খাতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, বড় এনজিওসমূহকে সরাসরি রাষ্ট্রের সাথে স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে দেবে। কিন্তু ছোট এনজিওগুলো রাষ্ট্রের সাথে সংঘাতে টিকে থাকতে পারবে না। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে পেটেন্ট ক্রয়, বাজার দখল, বাণিজ্য প্রসার ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সংগ্রামে ক্রমশ বড় এনজিওগুলোর গুরুত্ব বাড়বে এবং এনজিওসমূহ এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। ব্র্যাক এর মত দেশীয় (Indigenous) এনজিওর ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্তরে (ব্রাক আফগানিস্থান) ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে এই ধরনের নতুন রূপের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। যদি এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগতভাবে বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয় তাহলে রাষ্ট্র ও এনজিওসমূহের সম্পর্ক এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সম্ভবত রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে এনজিওদের মত প্রতিষ্ঠানের কাছে। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ একটি নব্য নির্ভরশীল ও ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া এনজিওসমূহ আজ চতুর্থ প্রজন্মে উন্নীত হয়েছে। এরাই বিশ্বায়নের নতুন ধারার সুযোগে পঞ্চম প্রজন্মের শক্তিশালী এনজিও হিসেবে আবির্ভূত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই পঞ্চম প্রজন্মের এনজিওদের সাথে কাজ করা ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও পদক্ষেপ কি হবে তা নির্ধারণ করাই বর্তমানে অতি জরুরী বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. Farrington, J, Lewis, D and others (eds) (1993), Non-Governmental Organization and The State in Asia, New York, Routledge.

২. রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত) (১৯৯৭) “দারিদ্র্য ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

৩. James Petras (1999), "NGO's In The Service of Imperialism" in Journal of Contemporary Asia, vol, 29 No. 4, Manila.

৪. বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৩) “বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি”। পাকি জনযুগ, ঢাকা।

৫. Saifullah, A.K.M. (2001). NGOs Capacity in Development Management: Experience from Bangladesh, Tampure University of Tampure Press.

৬. Korten, D.C. (1987): Third Generation NGO Strategies: A key to people-centered Development, World Development, Vol. 15, Supplement pp. 195-159.

৭. Korten, DC (1988): New Roles and Challenges for Asian NGOs in NGO strategic management in Asia: Focus on Bangladesh, Inonesia and the Philippines, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Development.

৮. Korten, DC (1990): G. Hing to the 21st Centuries volunter Action and Global Agenda, West Vestford Kumarian Press.

৯. Tvedt, (1988): Angels of Mercy or Development Diplomats? Trenton: Africa World Press.

১০. Kokarala S, 'Binding Civil Society and Direct Funding of Southern NGOs: A Review of Recent Literature; 2001 (1) Law, Social Justice and Global Development (LGD)., http://elj.warwick.ac.ul/globe/issue/2001-1/kakaral. html.

১১. Riddel, R C and Robinson, M (1993): The Impact of NGO Poverty Alleviation Projects: Results of the Case Study Evaluation, Working Paper 68, London: Overseas Development Institute.

১২. Smille, I (1994): Changing Patterns: Northers NGOs. Northers Governments. In Smillie I & H Helmich (eds.) Non-governmental Organizations and Governments: Stekeholders for Development, Paris: Development Centre of the Organization for Economic Cooperation and Development.

১৩. Douglas, J (1987): Economic Theories of Nonprofit Organizations, In Walter W Powell (ed.) The Nonprofit Section: A Research Handbook, PP. 43-54, New Haven: Yale University Press.

১৪. Clark, J. (1991) Demographizing Development: The Role of Volunteer Organizations, London: Earthscan.

১৫. Hulme, D and Mosely, P (1996). Finance against Poverty, Vol. 1 and 2, London: Routledge.

১৬. Elsenhans, H (1997): Marginality, Rent and the Non-Governmental Organizations, In Noorjahan Bava (edt.). Non-Governmental Organizations in Development: Theory and Practice, New Delhi, Kanishka Publishers, Pp. 21-50.

১৭. Hossain, Mahbub (1984): Credit for the Rural Poor: The Grameen Bank in Bangladesh, Research Monograph: 4, BIDS, Dhaka.

১৮. Paul, S (1995): Empowerment of the poor in Bangladesh: the BRAC stratergy center for Development studies, University of Wales at Swansea, Unpublished masters thesis. See Saifullah (2001)

১৯. অনুপম সেন (১৯৯৯) বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ , অবসর , ঢাকা।

ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা
জুন-২০০২/ জ্যৈষ্ঠ-১৪০৯

জেন্ডার ধারণা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

কাজী হাসান ইমাম*

Abstract : The gender issues in Bangladesh are considered to be a chronic problem of our patriarchal society. Despite several positive interventions undertaken by the Government over the last three decades, the position of women in the society did not improve at a satisfactory level. The present study mainly focussed on the conceptual issues and situation analysis with particular reference to some identified specific aspects of universally accepted gender issues. Gender issues bear socio-economic, cultural and political connotations. Therefore, these should be handled socially, economically, culturally, legally and politically. The key social change agents responsible for policy formulation, programme planning and their implementation should have gender-friendly attitudes in actualizing gender parity, equity and equality. Basically, the problems mostly lie in the grass root levels, where lack of education is very high; religious superstitions are still deep-rooted in every pore of the society; cultural believes have been integrated into life styles and poverty has stricken the doorsteps of people. There is a need for undertaking effective motivation and conscientization strategies by owning the problems at all levels, in the family, community, society and nation.

১.০ ভূমিকা

নারীর কোন আত্মপরিচয় নেই! সে কখনো কারো মা, কারো বোন, কারো কন্যা, কখনো বা কারো স্ত্রী ইত্যাদি—পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবত এটাই হচ্ছে নারীর তথাকথিত সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান (Status)। ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘকাল সারা বিশ্বে এটিই ছিল নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের বাস্তব চিত্র। কালের অবধারিত প্রবাহে আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারায় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জনসংখ্যার বর্ধিষ্ণু প্রবৃদ্ধি ও ভূমি-মানুষের প্রতিকূল অনুপাত মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীকে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিজের অধিকার, ক্ষমতা ও উন্নয়ন সম্পর্কে আগের তুলনায় অধিকতর সচেতন ও আত্ম-প্রত্যয়ী করে তুলছে। অন্যদিকে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে। ফলে নারীর "কুলবধূ"-চিত্রটি ধীরে ধীরে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে[১] এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে অথবা

---

* উপ-পরিচালক; বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

১ "কুলবধূ"-র ধারণাটি মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত একটি মৌলবাদী চেতনায় প্রকাশ, যেখানে আবরোধিত গৃহ-জীবনই নারীর অবধারিত ও অনিবার্য পরিণতি এবং সেটাই তাদের জন্য সবচেয়ে সম্মানের বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে প্রগতিশীল সমাজের দৃষ্টিকোণে নারীর নিজস্ব সত্ত্বা-বিকাশে "কুলবধূ"-র ধারণাটিই প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত এবং বঞ্চনার শুরু মূলত এখান থেকেই।

অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থার তাড়নায় উন্নয়নে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ছে। আর তাই নারীর কথিত "কোমল হাত"[২] ক্রমশ জীবন সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত এ পরিবর্তন পৃথিবীর সব দেশে এবং সব কালে একই হারে ঘটেনি। তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে সারা বিশ্বে পরিবর্তিত হয়েছে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

দীর্ঘ-দশক উন্নয়ন প্রয়াসের পর পেশাজীবীরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শুধু সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণেই যে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক তা-ই নয়, দারিদ্র বিমোচনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণের আলোকে বিশ্বব্যাংকের "Enhancing Women's Participation in Economic Development" শীর্ষক নীতিপত্র অভিমত পোষণ করেছে যে, নারীর অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকার সমর্থন প্রকারান্তে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, শিশুর অব্যাহত অস্তিত্ব (child survival) এবং সামগ্রিকভাবে পারিবারিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়, জন্মহার হ্রাস করে এবং ফলত তা জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হ্রাসে সহায়তা করে[৩]। এই জ্ঞাত প্রত্যর্পণ (known returns) সত্ত্বেও উন্নয়নে অবদান রাখা ও উন্নয়নের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধাগুলো শুরু হয় মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তুলনামূলক নিম্ন বিনিয়োগ দিয়ে এবং তা অব্যাহত থাকে সম্পদ ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের সীমিত প্রবেশাধিকারের (access) মাধ্যমে। আর মহিলাদের সুযোগ গ্রহণের ওপর আরোপিত আইন ও প্রথাগত বিধি-নিষেধ এবং অনুশীলন এ অবস্থাকে আরো নাজুক করে তোলে। ফলে বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন অগ্রগতি আনুপাতিক হারে মহিলাদের জন্য প্রত্যাশিত সুবিধা বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি[৪]। অধিকতর সমতাভিত্তিক[৫] ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, বিশেষত

---

২ "কোমল হাত" কথাটি নিঃসন্দেহে শ্রুতি মধুর, কিন্তু সম্মানের নয়। আর এটি হচ্ছে সমাজ-সৃষ্ট এক সুদূর প্রসারী জেন্ডার বিভেদ—শ্রম বিভাজিত এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পশ্চাৎপদ করে রাখার এক অনন্য কৌশল।

৩ The World Bank (1994): *Enhancing Women's Participation in Economic Development.* A World Bank Policy Paper, Washington D. C., p. 7.

৪ ibid, p. 10.

৫ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে সমতার নীতি অবৈষম্যমূলক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমতার নীতির বাস্তব প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে নারী বা অন্যান্য পশ্চাদপদ সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। সমতার নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতার কারণে দৃষ্টিগ্রাহ্য অথবা সামাজিকভাবে জেন্ডার বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ অতিক্রম করা—নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা নয়।

নারীর সমতায়ন[৬] ব্যাহত হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণে[৭]।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক অঞ্চলে খাদ্যোৎপাদনের অর্ধাংশই মহিলারা নিশ্চিত করে, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার দায়িত্বের প্রায় পুরোটাই তাদের ওপর বর্তায় এবং শিল্প শ্রমিকের এক-চতুর্থাংশ ও সেবা সেক্টরের এক-তৃতীয়াংশ শ্রমের যোগান দেয় মহিলারা। আয়-উপার্জনকারী কার্যক্রম ছাড়াও মহিলাদের গৃহস্থালি কাজের মধ্যে রয়েছে অসুস্থের সেবা করা, গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুর প্রতিপালন, খাদ্য তৈরি এবং খাবার পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ। তা সত্ত্বেও শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের প্রতি নারীর সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে তাদের উৎপাদনশীলতা তাদের স্থৈতিক (potentials) সামর্থ্যের তুলনায় অনেক নীচে থাকছে।

সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ এবং অর্থনীতিতে তাদের অবদানের স্বীকৃতি সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ এখন উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। নারীর ক্ষমতায়ন অর্থ হলো তাদের আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে নারীর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকা অপরিহার্য এবং নারীর ক্ষমতায়নে কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস নেয়া অত্যাবশ্যক। এগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তার "চেইন রি-অ্যাকশন" শ্রমবাজারে অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতিকে উদ্বুদ্ধ করবে, কর্মক্ষেত্রে তাদের সরব উপস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং ক্রমশ তারা নিজেরাই নিজেদের অধিকার অর্জনে সক্ষম হবে। কিন্তু সরকারি চাকুরিতে নারী-পুরুষের বিদ্যমান হার খুবই বৈষম্যমূলক। মূলত সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের নগণ্য উপস্থিতি কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ধারণার প্রতি সামাজিক উদাসীনতার নির্দেশক। বিদ্যমান পদ্ধতি সরকারের অবনমিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। মহিলারা তাদের নিজস্ব অধিকার ও মেধা বলে উচ্চাসনে আসীন হওয়ার ব্যাপারেও এক ধরনের অগ্রহণযোগ্যতার মনোভাব বিরাজ করে। তবে এ কথা স্মর্তব্য যে, বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য হলেও আজকের পৃষ্ঠপোষকতা মহিলাদের মধ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষ পুরুষের তুলনায় ভাল করার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে। যাহোক, প্রথম পর্যায়ে এটার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া

---

৬ সমতায়নের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ নারী-পুরুষের শারীরিক ও সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিলেও তারা মূলত নারীকে দুর্বল ও অনুপোযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে (যেমন সমাজ-সংস্কার বা নারীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ) বরং নারীকে বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয় (যেমন রাত্রিকালীন কাজে নারীর পরিবর্তে অধিকহারে পুরুষদের নিয়োগ করা, এখানে নারী কর্ম-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়)। সমতার নীতি মূলত নারীর প্রতি সমান আচরণ নয়, নারীর জন্য সমান প্রবেশিকারের *(access)* এবং সমান ফলাফলের *(result)* ওপর গুরুত্ব দেয়।

৭ Sen, Gita et. al. Ed. (1994): *Population Policies Reconsidered : Health, Empowernment and Rights. Harvard Series on Population and International Health,* HCPDS & IWHC, New York, p. 28.

অত্যাবশ্যক যে, মহিলারা সরকারে কাজ করতে পারে এবং ভাল করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং বর্ণিত মনস্তাত্ত্বিক বাধাগুলোর উত্তোরণ ঘটানো সম্ভব হলে ভৌত পরিবেশ উন্নয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিশ্চিত হবে।

২.০ জেন্ডার ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

জেন্ডার (Gender) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লিঙ্গ বা সেক্স। জেন্ডারের আভিধানিক এই অর্থ মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার শব্দটি ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার এবং সেক্স শব্দ দু'টির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা হচ্ছে। প্রখ্যাত নারী-প্রবক্তা কমলা ভাসিন এ শব্দ দু'টিকে একটি সহজবোধ্য উদাহরণে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "প্রকৃতি ছেলে ও মেয়ে তৈরি করে, সমাজ তাকে নারী ও পুরুষে পরিণত করে[৮]"। অর্থাৎ প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট ছেলে ও মেয়ে বৈষম্যমূলক সামাজিক অনুশাসনে একদিন নারী ও পুরুষে পরিণত হয় এবং একদিন তারা দু'টি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। আর সমাজ সৃষ্ট এই বিভেদের কারণেই পুরুষ উত্তম ও নারী অধম হিসেবে বিবেচিত এবং সেভাবেই আমাদের সমাজ সমাজে নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট যে, আভিধানিকভাবে সেক্স বা জেন্ডার শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বা শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, যা অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে নারীর শারীরবৃত্তীয় আরো আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো, নারী সন্তান ধারণে এবং শিশুকে নিজস্ব স্তন্য-দুগ্ধপান করাতে সক্ষম। কিন্তু পুরুষ তা নয়। এমন কি পুরুষের শারীরবৃত্তীয় এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই, যা তাকে উত্তমের আসনে আসীন করতে পারে। এক্ষেত্রে নারী অগ্রগণ্য। আর এ কারণে ঐশী গ্রন্থাবলীতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটাই হচ্ছে নারীর নিরপেক্ষ অবস্থান (Status)। কিন্তু জেন্ডার শব্দটি মূলত একটি ভিন্নতর অর্থ বহন করে। এই ভিন্নতর অর্থে জেন্ডার শব্দটি প্রথমে মনোবিজ্ঞানীরা এবং পরবর্তীতে নারী প্রবক্তারা ব্যবহার শুরু করেন। উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার শব্দটি এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। মূলত জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের অবস্থান বা ভূমিকা, যা পরিবর্তনীয়। জেন্ডার নির্দেশ করে একজন নবজাতক মেয়ে শিশু ও একজন ছেলে

৮ ভাসিন, কমলা (২০০২) ঃ *মেয়ে কী? ছেলে কী?* (অনুবাদ ঃ ফওজিয়া খোন্দকার ইভা), প্রক্ষিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৪।

শিশু কিভাবে সামাজিকভাবে যথাক্রমে একজন নারী ও একজন পুরুষে পরিণত হয়। সামাজিক বৈষম্যের যাঁতাকলে সৃষ্ট সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষের পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তাদের স্ব-স্ব ভূমিকায়, দায়িত্বে ও কর্তব্যে, আচার-আচরণে এবং পরিচিতিতে। আবার এ সকল বিষয়সমূহ নির্ধারণ করে সম্পদের বণ্টন, সুযোগ-সুবিধা এবং ভোগের অধিকার। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট লিঙ্গ বা সেক্স এবং সামাজিকভাবে সৃষ্ট লিঙ্গ বা জেন্ডার-এর মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান তার একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আভিধানিক লিঙ্গ বা সেক্স		আভিধানিক লিঙ্গ বা সেক্স	
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
ক. প্রাথমিক পার্থক্য * যৌন অঙ্গসমূহ * প্রজনন অঙ্গ * স্তন * ঋতুচক্র	ক. প্রাথমিক পার্থক্য * যৌন অঙ্গসমূহ * প্রজনন অঙ্গ * গোঁফ, দাড়ি	* পুরুষের চেয়ে হীন, দুর্বল ও অক্ষম। * নারী কোমল স্বভাবের। * নারী কেবল গৃহে আবদ্ধ থেকে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করে। * সন্তান লালন-পালন ও পরিবারের অন্যান্যের সেবা করা নারীর কর্তব্য ইত্যাদি।	* নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবল ও সক্ষম। * পুরুষ কঠোর স্বভাবের। * পুরুষেরা বাইরে আয়-উপার্জন করে। * পুরুষেরা রাষ্ট্র, সমাজ পরিচালনা করবে, রাজনীতি ও দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাবে ইত্যাদি।
খ. মাধ্যমিক পার্থক্য * গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব। * সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ প্রদান।	খ. মাধ্যমিক পার্থক্য * গ্রহণযোগ্য লিঙ্গীয় কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই।		
		** নারী-পুরুষের এ সম্পর্ক ও এ সম্পর্কিত ধারণা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৈজ্ঞানিকভাবে তা আদৌ সত্য নয়।*	

প্রকৃতির সৃষ্টি নারী-পুরুষের মধ্যে নারীর অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের। প্রকৃতি নারীকে যে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে, পুরুষের দ্বারা তা অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নির্যাতন আর বৈষম্যের শিকার হয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণে নারী পরিণত হয়েছে "হরিজনে[৯]"। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিচারে বলা যায় যে, লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ণীত নারী-পুরুষের ভিন্নতা, যা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা ভিন্নতা, যা সমাজ কর্তৃক আরোপিত এবং সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তনীয়। অন্য কথায়, সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানের গুণগত ও পরস্পর নির্ভরশীল চরিত্রকে প্রকাশ করে জেন্ডার।

উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার আলোচনা এখন সারা বিশ্বেই একটি উল্লেখযোগ্য আসন দখল করে আছে। উন্নয়নে নারী, নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বহুল আলোচিত বিষয়। "নারী উন্নয়ন"-কে কোন প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করার অবকাশ নেই। এজন্য নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে হবে। নারীকে মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে হলে জেন্ডার চাহিদা ও উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সঠিকভাবে নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন।

৯ ভাসিন, কমলা ও খান, নিঘাত সাইদ (২০০২) ঃ নারীবাদ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রাসঙ্গিকতা, (অনুবাদ ঃ ফওজিয়া খোন্দকার ইভা), প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭।

চাহিদা বলতে আমরা সাধারণত মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক বা মৌলিক চাহিদা। কিন্তু এই স্বাভাবিক চাহিদা আর জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তারতম্য থাকলেও বিশ্বব্যাপী নারী এখনো পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। আর তাই জেন্ডার চাহিদা বলতে নারীর চাহিদাকে নির্দেশ করা হয়। মূলত জেন্ডার চাহিদার অর্থ হলো নারী-পুরুষ ভেদে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর চাহিদা। নারীর এই পশ্চাৎপদতার কারণ মূলত দু'টি। প্রথমত সমাজের প্রচলিত জেন্ডার-শ্রমবিভাগের কারণে নারীকে তিন ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। এগুলো হচ্ছেঃ (১) পুনরুৎপাদনমূলক—যেমন, সন্তান জন্মদান, তাদের লালন-পালন, রান্না-ধোয়া-মোছা, ঘর-দোর পরিস্কার করা, পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ এবং সেবা-যত্নসহ গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ; (২) উৎপাদনমূলক—সমাজে যে সকল কাজের নগদ বিনিময় মূল্য আছে, অর্থাৎ যে সকল কাজের মাধ্যমে আয় উপার্জন করা যায় এবং (৩) সামাজিক ভূমিকা—যে সকল কাজ কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়। সামাজিক ভূমিকা আবার (ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা ও (খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা এ দু'ভাবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রথমটি সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থাপনাগত ভূমিকাকে নির্দেশ করে।

নারীর এই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলিত শ্রম-বিভাজনে নারীকে মূলত পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। প্রচলিত জেন্ডার শ্রম-বিভাজনের ফলে নারীর দৈনন্দিন কাজ, শ্রম-দিবসের মেয়াদ, দায়িত্ব ও জীবন-যাপন প্রণালী পুরুষ থেকে ভিন্নতর হয়। দ্বিতীয়ত সমাজে সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজস্ব পছন্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান অসমতা থেকেই জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। এ সকল বিষয় বিবেচনায় জেন্ডার চাহিদাকে (ক) বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা ও (খ) কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা এ দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখা হয়। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা হলো নারীর প্রাত্যহিক জীবন-যাপন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে বাস্তবত যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার উত্তোরণের জন্য উদ্ভুত চাহিদা। সমাজের প্রচলিত শ্রম-বিভাজনে নারীকে ইতোপূর্বে বর্ণিত যে তিন ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়, সে সকল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে উদ্ভুত চাহিদাই বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল চাহিদা পরিপূরিত হলে নারীর জীবন-যাত্রার মানের কিছুটা উন্নয়ন ঘটে, তার প্রাত্যহিক কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হয় এবং সে আরো সুষ্ঠুভাবে নিজস্ব ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। অন্যদিকে সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা মূলত সমাজে নারীর

জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনে সচেষ্ট। এ চাহিদা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর হীন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবস্থানগত সমতা বিধানের প্রয়াস নেয়। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণ বাস্তবত কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। এ চাহিদা প্রচলিত জেন্ডার শ্রম-বিভাজনের পরিবর্তন, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, অবৈষম্যমূলক মঞ্জুরী প্রাপ্তি, সম্পদের মালিকানা ও নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের ওপর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং যে কোন ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তিলাভ ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এ সকল চাহিদা একবার অর্জিত হলে তা চেতনাগত শক্তিতে রূপলাভ করে, ফলে তা আর প্রত্যাহার করা সম্ভব হয় না। সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের প্রয়োজনে নিম্নে বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার পার্থক্য নিরূপিত হলো ঃ

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা	কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা
* বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা পালনে সহায়তা করে অর্থাৎ জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন করে, প্রাত্যহিক কাজের বোঝা লাঘব করে এবং অধিকতর ফলপ্রসূভাবে নিজস্ব ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে।	* বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তন করে এবং নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, পছন্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে।
* তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয়, স্বল্পমেয়াদী ও অবিলম্বে পূরণীয়।	* দীর্ঘ-মেয়াদী, অবিলম্বে পূরণযোগ্য নয় বা পূরণ করা দুরূহ।
* নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটভিত্তিক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নারীর জন্য বিভিন্ন রকম।	* সকল নারীর ক্ষেত্রে সাধারণত একই ধরনের।
* দৈনন্দিন চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। যেমন খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জ্বালানী, পানীয় জল, নিরাপদ মাতৃত্ব ইত্যাদি।	* প্রতিকূল অবস্থা বা অধস্তন অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। যেমন নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাহীনতা ইত্যাদি।
* নারীদের পক্ষে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব।	* নারীরা সাধারণত সহজে চিহ্নিত করতে পারে না।
* নারীদের উপকারভোগী হিসেবে দেখা হয়।	* সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের চালিকা শক্তি হিসেবে দেখা হয়।
* নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।	* নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটায়।
* নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা বা সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন করে না।	* সমাজে নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা বা সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন করে তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে।
* নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের (জেন্ডার) উন্নয়ন ঘটায় না।	* নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের (জেন্ডার) উন্নয়ন ঘটায়।
* প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা যোগানের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। যেমন খাদ্য ও পুষ্টি সাহায্য, নলকূপ ও স্যানিটারী পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলা সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি।	* শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠন, উদ্বুদ্ধকরণ, রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ, আত্ম-নির্ভরশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাগাতার প্রয়াসের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।
* এ চাহিদা পূরণের উপায় ও উপকরণ বা শর্তাবলী প্রত্যাহার করা হলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে।	* একবার এ চাহিদা পরিপূরিত বা অর্জিত হলে তা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় এবং এ চাহিদা পূরণের জন্য নতুনভাবে কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে হয়তো নারীর বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব, কিন্তু এতে সমাজে তাদের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ সব সময় প্রান্তিক পর্যায়েই থেকে যাবে। অন্যদিকে কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পরিপূরিত হলে তা উন্নয়নে নারীর অধিকতর ও ব্যাপক অংশগ্রহণের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। উন্নয়নে নারীর ভূমিকার বাস্তব প্রয়োগ

নিশ্চিতকরণে জেন্ডার সংবেদনশীলতা[১০], জেন্ডার সচেতনতা[১১] এবং যথার্থ জেন্ডার পরিকল্পনা[১২] নিশ্চিত করা দরকার। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণ ও সুফল অর্জন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জেন্ডার পরিকল্পনা খুবই জরুরী। যথার্থ জেন্ডার পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

* আমরা যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকি তাতে উন্নয়নের প্রভাব নারী-পুরুষের ওপর সমভাবে ও নিরপেক্ষভাবে পড়ে না এবং উন্নয়নের সুফল, ব্যয়ভার ও দায়-দায়িত্ব সমভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে বন্টিত হয় না।
* উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি নিয়োগ পরিকল্পনায় এবং সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে জেন্ডার অন্ধত্ব[১৩] বিরাজ করে।
* উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নারীর তিনটি ভূমিকা পালনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয় না এবং নারীর কর্মভার বা বোঝা লাঘবে প্রয়োজনীয় কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয় না।
* নারীর সুযোগ প্রদান বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা তাদের অতীত পশ্চাৎপদতার প্রভাবের কথা ভুলে যাই এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীদের জড়িত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি না।
* অনেক নীতি প্রণেতা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ মনে করেন, জেন্ডার ইস্যু আমাদের বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং উন্নয়নের বিদ্যমান ধারা জেন্ডার ইস্যুকে ধারণ করতে পারবে না।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার ইস্যুসমূহ কিভাবে সম্বোধিত হতে পারে তা স্পষ্টায়নের ক্ষেত্রে "জেন্ডার সমতায়ন পরিকল্পনা কৌশলসমূহ[১৪]" বর্ণিত ধারণা পরিবর্তনে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে "জেন্ডার প্রভাব নিরূপণ" (Gender Impact Assessment বা GIA) পদ্ধতির ব্যবহার জেন্ডার সমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মূলত বিদ্যমান জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জেন্ডার উন্নয়নের অনন্য চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত।

---

১০ "জেন্ডার সংবেদনশীলতা" হলো নারী উন্নয়নে প্রচলিত জেন্ডার বিষয়সমূহ, পার্থক্য, ক্ষমতা, অসমতা, দক্ষতা এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো উপলব্ধি এবং বিবেচনা করে এগুলো কর্মসূচি, কৌশল ও কার্যক্রমে সন্নিবেশিত করার অভিপ্রায়কে বুঝায়।

১১ "জেন্ডার সচেতনতা" হলো জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও মনোভাব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির কেন্দ্রে নারীর চাহিদা ও অগ্রাধিকারকে স্থাপন করার অঙ্গীকার।

১২ "জেন্ডার পরিকল্পনা"র লক্ষ্য হলো উন্নয়নের চালিকাশক্তি ও উপকারভোগী ও উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত জেন্ডার শ্রমবিভাগের ধারণাকে অতিক্রম করে নারীকে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব হিসেবে নারীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

১৩ "জেন্ডার অন্ধত্ব" হলো এক ধরনের অহেতুক ধারণা, যেখানে উন্নয়নের সুফল আপনা-আপনি সমভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে বন্টিত হবে, উভয়েই সমভাবে লাভবান হবে এবং সমান দায়-দায়িত্ব বহন করবে বলে বিবেচনা করা হয়। এ ধারণা সমাজে জীবনের কাম্যতা বা পছন্দ-অপছন্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার যে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে তা উপলব্ধি করে না।

১৪ PLAGE (Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality Planning) Project (2002): *Handbook on Gender Equality Planning Tools.* Ministry of Women and Children Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

৩.০ বাংলাদেশের জেন্ডার চিত্র

ইতোপূর্বে জেন্ডার ইস্যুসমূহ সম্পর্কে যে সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা বরং আরো খারাপ। বিগত তিন দশক ধরে সরকারের নানাবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও সমাজে নারীর অবস্থানের আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি। উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পুরুষের চাহিদাকে ঘিরে আবর্তিত প্রচলিত এ সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ এক নতুন প্রেক্ষিত ও নতুন সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আত্মপোলব্ধির প্রক্রিয়া খুবই ধীরগতি সম্পন্ন এবং তা কেবল সমাজের কিছু ক্ষুদ্রাংশে বা পকেটে সীমিত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মহিলা এখনো গভীর বৈষম্যের শিকার। জন্ম থেকে শৈশব, এমন কি তার পরেও মহিলারা খুবই কম অধিকার এবং সুবিধা ভোগ করতে পারে। এর প্রমাণ অসংখ্য এবং সর্বদাই দৃশ্যমান। দেশে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার কম। অতীতে তাদের অর্থনৈতিক অবদানকে পরিমাপ করা হয়নি এবং তার স্বীকৃতিও দেয়া হয়নি[১৫]। সামাজিক বৈষম্যের কারণে মেয়েদের জন্মগত জৈবিক সুবিধাবলী (in-built biological advantage) খুব দ্রুতই নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে মেয়ের থেকে ছেলেদেরকে বেশি মূল্য দেয়া হয়, সেখানে নারীর তুলনামূলক নিম্ন-মর্যাদা সমাজে গভীরভাবে গ্রোথিত। মাতা-পিতার দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু হচ্ছে পরিবারের সাময়িক অতিথি, যারা বিয়ের পরে অন্যের ঘরে চলে যায় এবং এজন্য মোটা অংকের যৌতুকের ব্যবস্থা করতে হয়। এমন কি বিয়ের পরে নতুন পরিবারেও নারীকে সেই চিরাচরিত নিম্ন-মর্যাদার গ্লানি বহন করে বেড়াতে হয়[১৬]।

দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে অনেক পুরুষই মেয়েদের সন্তান ধারণ, তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণকে কোন কাজ হিসেবে গণ্য করে না। বরং এগুলিকে মেয়েদের স্বভাবজাত হিসেবে মনে করা হয়। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর কাজের প্রকৃত মূল্যায়নের অভাব দেখা যায় নানাভাবে। "পুরুষেরা মেয়েদের কোন কাজ (?) করতে চায় না। তারা মনে করে এতে তাদের সম্মান হানি হবে।"—ঝগড়াপুরের এ চিত্রটি[১৭] শুধু গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায়ই নয়, আমাদের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে গ্রোথিত।"...... তারা (পুরুষেরা) যেমন নিজেরা গৃহস্থালির কোন কাজ করে না তেমনি তাদের মেয়েদেরও গৃহস্থালির বাইরের কোন কাজ করতে দেয় না। ......" —এ চিত্রটিও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবারে এখনো দৃশ্যমান।

---

১৫ Mian, Md. Moazzem Hossain & Imam, Kazi Hasan (1994): Basic Services for Children and Women Development (CWD) in Urban Areas of Bangladesh. A research mimeo, Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka, p. 2.

১৬ Monsoor, Taslima (1999) : *From Patriarchy to Gender Equity : Family Law and its Impact on Women in Bangladesh*. The University Press Limited, Dhaka, p. 32.

১৭ মতিন, নিলুফার (১৯৯৮) ঃ ঝগড়াপুর ঃ গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী (বাংলা রূপান্তর),মুল ঃ আরেন্স, ইয়েনেকা ও ব্যুরদেন, ইওস ফান, গণপ্রকাশনী, গণমুদ্রণ লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫০।

পুরুষ শাসিত এ সমাজের যে স্তরেই আমাদের অবস্থান হোক না কেন, বাস্তবত এটাই নির্মম সত্য যে, আমরা এখনো সম্পূর্ণভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারিনি। জন্মগতভাবে আমরা একজন নারী-কে "নারী" হিসেবে বা বড়জোর "মেয়ে-মানুষ" হিসেবে দেখতে শিখেছি, "সমাজের একজন মানুষ" হিসেবে দেখতে শিখিনি। নজরুলের সেই অমিয় বাণী—"এ পৃথিবীতে যা কিছু মহান যা কিছু কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"—শুধু সাহিত্যের বর্ণিল চত্বরে দীপ্যমান হয়ে আছে, আমাদের বাস্তব আচরণে এখনো তার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেনি।

নারীর প্রথাগত দাসত্বাবস্থা বাংলাদেশে আইনের মাধ্যমেও স্বীকৃত। সংবিধানে নারীর সম-অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তারপরেও সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইতিবাচক জেন্ডার বৈষম্য [আর্টিকেল ৬৫(৩)]। আর্টিকেল-১০, যা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের একটি, এখানে বলা হয়েছে—Steps shall be taken to ensure participation of women in all spheres of national life—এটার অর্থ হলো বিদ্যমান অবস্থায় নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয় এবং এ বৈষম্য দূর করার জন্য সাংবিধানিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে[১৮]। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন, বিদ্যমান ধর্মীয় আইনসমূহ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অনুশীলন, অশিক্ষা, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে। মূলত এগুলোই মানুষের সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে।

ঐতিহাসিক কারণসমূহ এবং নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য সত্ত্বেও অবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন ঘটছে। অনেক শূন্যস্থানই ধীরে ধীরে পরিপূরিত হচ্ছে। কিছু কিছু পরিবর্তন সমাজে এ সম্পর্কিত ব্যাপক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটায়। উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এনজিও-গুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাদের ব্যাপক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিভাত। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ, সুশীল সমাজের আন্দোলন, নারীর অধিকার সম্পর্কে নতুন নতুন প্রকাশনা, নতুন আঙ্গিকে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, ফর্মাল সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের চাকুরি, মহিলাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উন্নয়ন, ১৯৯৫ সালের বেইজিং ঘোষণা, ১৯৯৭ সালে ঘোষিত "নারীর অগ্রসরায়ণে জাতীয় নীতিমালা" (National Policy for the Women's Advancement), সাম্প্রতিককালে প্রণীত নারী অধিকার সংরক্ষণে বেশ ক'য়েকটি নতুন আইন, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়াদির ফলপ্রসূ মোকাবেলায় মহিলা ও শিশু নিপীড়ন আইন প্রণয়ন, মহিলাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সিডো সনদের আর্টিকেল ১৩(১) ও ১৬(১)-এর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি প্রত্যাহার, রাজনীতি ও

১৮ op cit, p. 126

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম শক্তিশালীকরণ ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সমন্বয়নে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীবৃত্তি প্রবর্তন, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল সুবিধা, ডে-কেয়ার সেন্টার, নিপীড়িত মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা এবং আইনী সহায়তা কোষ ইত্যাদি সহায়ক-সেবার (Support Services) সংস্থান করা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত ৪৪টি ফোকাল-পয়েন্ট সিডো কমিটিতে উত্থাপিত এবং জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে এগুলোর স্বীকৃতি লাভ, সরকারের নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিওগুলোর অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "Department of Women Studies" নামে বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস ডিগ্রীসহ একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর "Gender Dimensions in Development" শীর্ষক পৃথক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জেন্ডার সমতা পরিকল্পনা কৌশলসমূহ (Gender Equality Planning Tools) ব্যবহারে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি এক্ষেত্রে কতগুলো জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

আলোচ্য সকল অর্জন সত্ত্বেও মহিলাদের অনুন্নয়নের মূল কারণ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা। প্রয়োজনীয় ক্যালোরী গ্রহণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি, চাকুরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে মহিলারা তুলনামূলক কম সুযোগ ভোগ করে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদেরকে সম-অবস্থানে দেখতে এখনো আমরা মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত নই। এ সকল বিষয়ের ফলশ্রুতিতেই মহিলারা আজো অনুন্নত এবং আমাদের দেশের মহিলাদের অনুন্নয়নের সমস্যাগুলো মূলত জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি পুরুষদের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোর ব্যাপক সম্প্রচার, বর্ধিষ্ণু সামাজিক সচেতনতা, নতুন নতুন ও কঠোর আইনের প্রবর্তন, সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ, বর্ধিষ্ণু সুশীল সমাজ এবং এনজিও-আন্দোলন সত্ত্বেও সমাজে এখনো নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা অনেক। বাংলাদেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা সাধারণত শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন এবং যৌন-হয়রানি সহ্য করতে বাধ্য

হন, যার অনেকটাই আমাদের গোচরেও আসে না[১৯]। সমাজে শুধু নারীরাই যে পুরুষের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা নয়। এর উল্টোটি নিয়েও বিদগ্ধ মহলে আলোচনা আছে। উদাহরণত সেই চিরায়ত প্রবাদ—"রাজা শাসিছে রাজ্য, রাজারে শাসিছে রাণী"—যা এখনো আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে বাস্তব সত্য হিসেবে বিরাজমান বলে বিদগ্ধজনেরা মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়টি বহুল কথিত বা প্রচারিত (propagated) নয়। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া তাঁর "নারীস্থান[২০]"-এ যে স্বপ্ন রচনা করেছিলেন, তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতাপের প্রতি মহিলাদের অন্তর্নিহিত অনুভূতির গোপন চিত্র তুলে ধরে।

৪.০ বিশ্লেষণ

ইউএনডিপি'র দৃষ্টিকোণে জীবনের সর্ব-পরিসরে জেন্ডার সমতা হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ইএনডিপি'র বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সকল কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের—উক্ত কর্মসূচি যাদের জীবনকে প্রভাবিত করে—তাদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণই হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা[২১]। আর এ সকল কর্মসূচি প্রাত্যহিক পারিবারিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে বৃহদাংশ বৈশ্বিক জনসংখ্যার সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে। সারা বিশ্বেই কিছু উপরি আচার-আচরণের পরিবর্তন ছাড়া নারী-পুরুষের শ্রম ও ক্ষমতা বিভাজনের মৌলিক ব্যবস্থাপনা একই রয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বের বেশির ভাগ এলাকায় মানব ইতিহাসের প্রায় পুরোটা জুড়েই সন্তানের ভবিষ্যৎ, তার বসবাসের স্থান নির্বাচন, বিবাহ, বংশানুক্রমিক অধিকার, চাকুরি ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার খুবই নগণ্য[২২]। যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক মিথস্ক্রিয় অ্যাকশন রিসার্চে দেখা গেছে, পারিবারিক সকল ঝুট-ঝামেলা পোহানোর দায়িত্ব শুধুই মহিলাদের—কর্মক্ষেত্রে ও পেশায় পুরুষের অধিকমাত্রায় উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট এ ধরনের আত্ম-প্রসাদই জেন্ডার বৈষম্যের জন্ম দেয়[২৩]। সমাজ খুব ভালভাবে কাজ করে যখন মহিলারা ঘরে থাকে আর পুরুষেরা বাইরে কাজ করে—সমাজের গভীরে

১৯ Ibid, pp. 37-38.

২০ নারীস্থানের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো পুরুষদেরকে বোঝানো যে, তাদের অনুভূতি কেমন হতো যদি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তারা যদি মহিলাদের অনুরূপ সম্মুখীন হতো এবং মহিলারা যদি তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করত, এখন যেমনটি তারা মহিলাদের প্রতি করে। আর এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে নারীর প্রতি পুরুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

২১ UNDP (1996): Overview : UNDP's 1996 Report on Human Development in Bangladesh—A Pro-Poor Agenda, Orchid Printers, Dhaka, p. 27.

২২ Afkhami, Mahnaz (1999): A Vision of Gender in Culture. In : Serageldin, Ismail and Martin-Brown, John (ed.) : Culture in Sustainable Development : Investing in Culture and Natural Endowments, The World Bank, Washington D. C., pp. 47-48.

২৩ Bailyn, Lotte et. al. (2000) : Moving Corporations in the United States Towards Gender Equity—A Cautionary Tale. In : Haas, Linda L. et. al. ed. : Organizational Changes and Gender Equity : International Perspectives on Fathers and Mothers at the Workplace, Sage Publication, Inc., London, New Delhi, pp. 167-179.

গ্রোথিত কিন্তু প্রায়শ অকথিত এই বিশ্বাসই আরোপিত জেন্ডার ভূমিকার মাধ্যমে সৃষ্ট জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দায়ী। এটা জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি বিদ্যমান সুস্পষ্ট এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার নির্দেশ করে।

জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে শিক্ষা কার্যত লিভারের মত ভূমিকা পালন করে[২৪]। জীবন-যাপনে মহিলাদের প্রান্তিকতার জন্য মূলত তাদের শিক্ষাহীনতাই দায়ী। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে শিক্ষার নিম্ন হার, বিশেষত নারী শিক্ষার নিম্ন হারের কারণেই জেন্ডার-গ্যাপ খুবই সুস্পষ্ট[২৫]। সামগ্রিকভাবে জেন্ডার-দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্তমান সমীক্ষায় নিম্নের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বজনীন জেন্ডার-ইস্যুসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

৪.১ জন্মাধিকারে বৈষম্য

বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত প্রত্যাশা ও উদ্বেগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজে এ বিষয়ে সচেতনতাও দিন দিন বাড়ছে। মানুষ, বিশেষত সুশিক্ষিত জনেরা এটা অন্ত ত অনুধাবন করছেন যে, "আমি মেয়ে থেকে ছেলে সন্তান বেশি পছন্দ করি"—এ কথাটি এখন আর খোলামেলা বলাটা শোভনীয় নয়। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র একটি সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ লোক ছেলে-সন্তান পছন্দ করেন। সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের বয়স্ক লোকেদের মধ্যে সুস্পষ্ট জেন্ডার-পছন্দ (ছেলে-সন্তান পছন্দ) বিদ্যমান[২৬]। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে-সন্তান না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে একটার পর একটা সন্তান গ্রহণে বাধ্য করা হয়[২৭]। মেয়ে-সন্তান অপেক্ষা ছেলে-সন্তান পছন্দ করার পেছনে যে কারণগুলো কাজ করছে, তা নিম্নরূপ ঃ

* ছেলেরা বংশগতির ধারা (Generation Flow) এবং পারিবারিক অবস্থান (Family Status) রক্ষা করে;
* তারা বৃদ্ধ বয়সে মাতা-পিতার পরিচর্যা করে;
* তারা সাধারণভাবে পারিবারিক দায়িত্ব কাঁধে নেয়;
* তারা মাতা-পিতা ও পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা দেয়; এবং
* তারা স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরায় সক্ষম।

অন্যদিকে যাঁদের এ ধরনের জেন্ডার-পছন্দ নেই তাঁদের মতে ঃ

* যথার্থভাবে মানুষ করতে পারলে মেয়েরাও তাদের মাতা-পিতাকে সাহায্য করতে পারে;
* বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা মাতা-পিতার পরিচর্যা করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই;

---

২৪ Mongella, Gertrude (1995) : Women and Education : The Ultimate Lever. In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, The University Press Limited, Dhaka, p. 114.

২৫ ibid, pp. 114-115.

২৬ Fyzennessa, Noorunnahar (1994) : The Status of Reproductive Rights and Women's Health : Findings of a Survey. In : Jahan, Roushan et el. : Reproductive Rights and Women's Health, Women for Women, p. 67.

২৭ Ibid, p. 64.

* ছেলে-মেয়ে উভয়েই জাতীয় জীবনে অবদান রাখতে সক্ষম;
* মেয়েরা ঘর-দোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ও রান্নার কাজে মায়েদের সহায়তা করে; এবং
* জীবনের সকল পরিসরে ছেলে-মেয়ে উভয়েই সমান।

উপর্যুক্ত মতামত বিশ্লেষণে এটা সহজেই অনুমেয় যে, বংশগতির ধারা রক্ষা করার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচিত হলেও জেন্ডার-পছন্দের পেছনে মূল কারণগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক। যদি যথার্থরূপে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হ'ত অথবা তারা যদি তাদের মাতা-পিতা ও পরিবারকে অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হ'ত, তাহলে বিদ্যমান জেন্ডার-পছন্দের প্রকৃতি বা ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন হ'ত।

৪.২ খাদ্য ও পুষ্টি

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা। সাধারণত জৈবিক দৃষ্টিকোণে পুরুষের তুলনায় নারীর কিছুটা কম ক্যালোরির প্রয়োজন হলেও গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃ-দুগ্ধদানকালে নারীর অধিক পরিচর্যা ও অধিক পরিমাণ ক্যালোরির আবশ্যকীয়তা দেখা দেয়—যে বিষয়টি আমাদের সমাজে প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মেয়ে-শিশুরা সব সময়ই পুষ্টির অভাবে ভোগে। ৫ বছরের নীচে এবং ৫-১৪ বছর বয়সের মেয়েরা সাধারণত সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় যথাক্রমে ১৬% এবং ১১% কম ক্যালোরি গ্রহণ করে[২৮]। এটা যে শুধুমাত্র অল্প বয়সী মেয়েদের মধ্যেই ঘটতে দেখা যায় তা নয়, প্রাপ্ত বয়স্ক নারীরাও নানা আর্থ-সামাজিক কারণে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। পারিবারিক খাদ্য তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও মেয়েরা সাধারণত সবার শেষে এবং পরিমাণে কম খায়[২৯]। আর এ সকল কারণ তাদের জন্য এক "পুষ্টিহীনতার দুষ্ট চক্র" সৃষ্টি করে। অনেকে মনে করেন, কঠোর শ্রমের কারণে নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি খাদ্যের প্রয়োজন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এটাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসেবে বিবেচিত এবং সমাজের মেয়ে ও নারীদের মধ্যেও বিষয়টি গভীরভাবে গ্রোথিত হয়ে আছে।

৪.৩ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে আরো নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা বাধার সৃষ্টি করবে না। সংবিধানের এই গ্যারান্টি-ক্লজ, সরকারের বহুবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং এনজিও-সমূহের অনেক আকর্ষণীয়

---

২৮ Rogers, Barbara (1995) : Women and Nutrition and Health. In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, University Press Limited, Dhaka, p. 97.

২৯ Muntemba, S & Dankelman, I (1995) : In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, University Press Limited, Dhaka, p. 135.

ইন্‌সেন্টিভ প্যাকেজ-অফার সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বস্তরে জেন্ডার-বৈষম্য বিরাজ করে[৩০]। নাইরোবি প্রতিবেদন অনুসারে- "Education is the basic tool for the full promotion and improvement of the status of women. It is the basic tool that should be given to women in order to fulfill their roles as full members of the society"[৩১]—একটি সাক্ষাৎকারে মহিলারা একই ধরনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, শিক্ষা হচ্ছে নারীর হাতে একটি অস্ত্র, যা দিয়ে সে কাজ করতে, ইচ্ছা করলে তা দিয়ে সে অর্থ উপার্জন করতে পারে, তার স্বামীকে পারিবারিক জীবন যাপনে সহায়তা করতে পারে, সে তার ছেলে-মেয়েদের অপেক্ষাকৃত ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারে এবং পরিচর্যা করতে পারে। আবার এ শিক্ষার মাধ্যমে সে তার উপযোগী একজন জীবন-সঙ্গী বেছে নিতে সক্ষম হবে, যে তাকে যথার্থ মর্যাদায় উপযুক্ত আসনে আসীন করবে[৩২]।

বিগত দু'দশকে আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের নিবন্ধন উৎসাহব্যঞ্জক হারে বৃদ্ধি পেলেও ঝরে পড়ার হারও (dropout rate) খুবই উদ্বেগজনক। গ্রামীণ এলাকার প্রায় সকল এবং শহর এলাকার দরিদ্র পরিবারের মাতা-পিতা মেয়ে-শিশু থেকে ছেলে-শিশুকেই শিক্ষাদানে প্রাধান্য দেয়[৩৩]। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশীলনের কারণে তাদের বেশির ভাগই মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকে পছন্দ করে না। তারা মনে করে, শিক্ষিত হলেই মেয়েরা স্বাধীনচেতা হয়ে পড়বে, যা তাদের নিজেদের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য খুবই বিপজ্জনক[৩৪]। মেয়েদের শিক্ষার ওপর সামাজিক শ্রেণী ও জেন্ডারভিত্তিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের দ্বারাই বেশি অনুভূত হয় এবং সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান যত উচ্চে, তাদের মধ্যে নারী-শিক্ষার ব্যাপারে এই আগ্রহ তত বেশি দেখা যায়[৩৫]।

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, শিক্ষিত পরিবারে মেয়ে-শিশুদেরকে গৃহশিক্ষকের সুবিধা সম্প্রসারণের আগ্রহ বেশি। অনেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অধিক গুরুত্ব দেয়। তাঁরা মনে করেন, মেয়ে-শিশুদের তুলনায় ছেলে-শিশুদেরকেই ভবিষ্যতে বাস্তব জীবনে বেশি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জন্য পরিবহন, আবাসন এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।

---

৩০ Husain, Syed Anwar (1995) : Women's Empowerment : Education and Culture. In : Jahan, Roushan. : Empowerment of Women: Nairobi to Beijing (1985-1995), Women for Women, Dhaka, p. 91.

৩১ The Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women, 15-26 July, 1985, New York, United Nations, 1989, p. 41.

৩২ Mongella, Gertrude (1995) : Women and Education : The Ultimate Lever. In: Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, The University Press Limited, Dhaka, p. 117.

৩৩ ibid, p. 119.

৩৪ Op cit, p. 116.

৩৫ Duza, Asfia and Begum, Hanida A (1993) : Emerging New Accents : A Perspective of Gender and Development in Bangladesh. Women for Women, Dhaka, pp. 35-37.

বর্তমান সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে, সরকারি কর্মকর্তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, মেয়েরা শিক্ষার বিশেষ কিছু বিষয়ে ভাল করতে পারে। তাঁরা মনে করেন, শান্ত মেজাজ, মনোযোগিতা, আন্তরিকতা, ধৈর্য, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর কারণে শিক্ষা, চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নার্সিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, চিত্রকলা, সংস্কৃতি, গান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল করতে পারে। তবে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় অধিকতর মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন। অন্যদিকে মেয়েদের শেখার ক্ষমতা, ধৈর্য এবং শৃঙ্খলাবোধ বেশি। কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে বোঝার ক্ষমতা, ফলাফল, সহনশীলতা ইত্যাদি কার বেশি এ ব্যাপারে জেন্ডার-ভেদে মত-পার্থক্য দেখা যায়।

৪.৪ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদিতে প্রবেশাধিকার

অগণিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নব্বুইয়ের দশকে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের শিশু ও মহিলা স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি বিশেষত বড় বড় শহর ও নগরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ সকল সুবিধাদির কতটুকু মহিলাদের দ্বারে পৌঁছেছে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। মহিলাদের স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণ শুধু কারো আর্থিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়। দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়াবলী এখানে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা ভোগ করে। এছাড়াও বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে ব্যয়বহুল চিকিৎসা সুবিধাদি পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই ভোগ করে থাকে। আর মহিলাদেরকে সাধারণত কম ফলপ্রসূ চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদান করা হয়[৩৬]।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে এক বিচিত্র মাইন্ড-সেট বিদ্যমান। তারা প্রায়শই তাদের নিজের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে তাদের শিশু ও পরিবারের প্রয়োজনকে বড় করে দেখে[৩৭]। প্রকৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশের মেয়েরা মানিয়ে চলায় অভ্যস্ত। তারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে তাদের খাবারের অনেকাংশ অবলীলায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পাতে তুলে দেয়। আর এ সকল কারণে ধীরে ধীরে তারা নীরবে পুষ্টিহীনতার চক্রে নিপতিত হয়। "Since suffering in silence is culturally ascribed feminine attribute—so too is its spin-off effect on health. The 'culture of silence and endurance' encourages women to give lower priority to their health needs compared to the demands of other family

---

৩৬ Khutun, Khadija & Others ed. (1995) : Women and Development : Relevant Statistics. March, 1995, Women for Women, Dhaka, pp. 104-109.

৩৭ Younis, Nabil et al. (1994) : Learning about the Gynecological Health of Women. The Policy Series in Reproductive Health, No. 2, The Population Council, Cairo.

members and reinforces their lower status[৩৮]"। এ কারণে ভগ্ন-স্বাস্থ্য মহিলাদের মধ্যে জাতিগত সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা মেয়ে-শিশু অপেক্ষা ছেলে-শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে[৩৯]। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণে মেয়েদেরকে জন্মলগ্ন থেকেই দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছেলেদের তুলনায় তাদেরকে হেলাফেলাভাবে লালন-পালন করা হয়। এ কারণে তারা বেশি অসুস্থ-প্রবণ আর চিকিৎসা সুবিধাও পায় কম[৪০]। গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত নারীর ভূমিকা—স্ত্রী ও মা—এ সম্পর্কিত না হলে অসুস্থতার ক্ষেত্রে মহিলারা প্রায়শই স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়[৪১]। তাদের অসুস্থতার বিষয়টি তখনই গোচরীভূত হয়, যখন তার প্রভাব পরিবার প্রধানের ওপর পড়ে। যৌথ পরিবারে সাধারণত স্বামী কর্তৃক তাদের অসুস্থতার বিষয়টি গোচরীভূত হয়, যখন তার অসুস্থতার কারণে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা পরিবারের কাজ-কর্ম অচল হয়ে পড়ে[৪২]।

৪.৫ চাকুরির সুযোগের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার

প্রজাতন্ত্রের চাকুরির ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান প্রবেশাধিকার সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে[৪৩]। এছাড়া উন্নয়নে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোটা-পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এনজিও এবং সরকারি এজেন্সীসমূহ প্রায়শই বিভিন্ন চাকুরির ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মহিলাদের বাড়ির বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ইতিবাচক—যতক্ষণ এ কারণে পরিবারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়[৪৪]। অপর এক সমীক্ষায় ফলাফলে দেখা গেছে, কর্ম-পরিবেশে মহিলা শিল্প-শ্রমিকেরা পুরুষের তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। তাদেরকে সাধারণত কঠিন কোন দায়িত্ব দেয়া হয় না, এমন কি যখন মহিলা ও পুরুষ একই ধরনের কাজ করে। কেউ কেউ এটাকে মহিলাদের কর্ম-নিপুণতার বদলে পুরুষের শক্তিকে পুরস্কৃত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক[৪৫] মর্মে আখ্যায়িত করেন। অন্যেরা এটাকে মহিলা সহকর্মীদের প্রতি পুরুষদের সহমর্মিতা বলে আখ্যায়িত করতে পারে।

---

৩৮ Rogers, Barbara (1995) : Women and Nutrition and Health. In : Haider, Raana. : A Perspective in Development : Gender Focus, University Press Limited, Dhaka, p. 105.

৩৯ Gribble, James N. and Preston, H. Samuel (1993) : The Epidemiological Transition : Policy and Planning Implications for Developing Countries, National Academy Press, Washington D. C.

৪০ op cit, p. 96.

৪১ Khattab, Hind et. al. (1994) : Methodology for Entry in the Community. The Policy Series in Reproductive Health. No. 3, The Population Council, Cairo.

৪২ Government of the People's Republic of Bangladesh (1988) : Bangladesh Heath Services Report, Dhaka.

৪৩ Government of the People's Republic of Bangladesh. : Bangladesh Constitution. Dhaka, p. 8. Part-III.

৪৪ Charles, Nickie (1993) : Gender Division and Capitalism. In : Gender Division and Social Change, Harvester, Wheatsheaf, Hertfordshire, UK.

৪৫ Hossain, Hameeda et al. (1990) : No Better Option? Industrial Women Workers in Bangladesh. University Press Limited, Dhaka.

অনেকে মনে করেন, মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ ধরনের চাকুরি, বিশেষত চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং, ডে-কেয়ার-সার্ভিস, সাচিবিক কার্যক্রম, কম্পিউটার, টেলিফোন অপারেটিং, ব্যাংকিং, গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশাসন ইত্যাদি পেশাকে উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন।

অনেকে চাকুরির সুযোগ প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্যে দেন এজন্য যে, পুরুষদেরকেই একদিন পারিবারিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। অন্যদিকে অনেকে সমাজে মেয়েদের অবহেলিত অবস্থান ও বিদ্যমান জেন্ডার-বৈষম্যের কারণে চাকুরিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪.৬ কর্ম-পরিবেশে জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে অথবা জীবনের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে পেশাজীবী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মহিলারা তাদের দীর্ঘ-শতকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথার বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আর এগুলো করতে গিয়ে কর্ম-পরিবেশে তারা কখনো অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে, আবার কখনো তাদেরকে নানামুখী সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অধস্তনদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীরা খুবই আত্মপ্রত্যয়ী। পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে তাদের কাজের মান খুবই সন্তোষজনক[৪৬]। একই সাথে এমনও উদাহরণ আছে যে, পুরুষ বসেরা তাদেরকে প্রথমে মহিলা এবং পরে কর্মী হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের স্থৈতিকতা (Potentiality)/সৌজন্যবোধকে প্রায়শই ভুল বোঝা হয়। কর্মজীবী মহিলাদের কর্ম-দক্ষতাকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখা হয়; অফিসের সহকর্মীরা একজন মহিলার শ্রেষ্ঠত্বকে মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না; অধস্তন পুরুষ সহকর্মীরা তাদের ওপর একজন মহিলার কর্তৃত্ব পছন্দ করে না[৪৭]। আমাদের সমাজে লিঙ্গ-বিভাজিত কর্ম-বৈষম্য মূল্যবোধের অংশ হিসেবে বিবেচিত। যার ফলে বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের প্রবেশাধিকারকে অস্বীকার করা হয়[৪৮]। ফলে পেশাজীবী ও কারিগরী চাকুরিতে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। কর্মজীবী মহিলারা প্রায়শই তাদের বস্ কর্তৃক যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়[৪৯]। অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, একই পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে কর্ম-বন্টনের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষ বসের আনুকূল্য পেয়ে থাকে এবং তুলনামূলক সহজ ও হালকা কাজগুলো (যেমন যে কাজে

৪৬ Haque, A. K. M. Hedayatul and Bala, Hiralal (1988) : Women in the Bangladesh Civil Services, Bangladesh Public Administration Training Centre, Saver, Dhaka, pp. 70 and 110.

৪৭ Maitra-Sinha, Anjana (1993) : Women in Changing Society. Ashish Publishing House, New Delhi, p. 42.

৪৮ Jahan, Selina Akhter (1991) : Recent Bangladesh : Women and Children. Vasa Prokash, Dhaka, p. 10.

৪৯ ibid.

শারীরিক পরিশ্রম কম লাগে, ভ্রমণ কম করতে হয় অথবা কম ঝুঁকিপূর্ণ) সাধারণত তাদেরকে দেয়া হয়[৫০]।

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষ উভয়েরই একটি নির্দিষ্ট মানের কর্মদক্ষতা রয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সংগঠন, নেতৃত্ব প্রদান, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিচালনা, উদ্বুদ্ধকরণ, তত্ত্বাবধায়ন, যোগাযোগ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রফেশনাল দক্ষতা, কাজের গুণগত মান ও গতি, প্রকাশ ক্ষমতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা, বিচার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, সহযোগিতা, সচেতনতা এবং দলগত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের সামর্থ্য নারীর তুলনায় বেশি। অন্যদিকে মহিলারা অধিকতর সৎ, শৃঙ্খলাবোধ-সম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য।

৪.৭ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা

সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০%-এর বেশি মহিলা কর্মকর্তা যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের পুরুষ তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার ওপর নির্ভরশীল[৫১]। অপরদিকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন যে, মহিলা কর্মকর্তাদের ৬৬% দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুবই পারদর্শী [৫২]। কিন্তু বেশ কিছু সমীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রত্যাশা প্রায়শই পুরুষের আধিপত্যে পদদলিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর তুলনায় পুরুষেরা অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে। জীবনসঙ্গী নির্ধারণে মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষেরা খুবই রক্ষণশীল। পরিবারের কনিষ্ঠ মহিলা-সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তাদের আস্থা খুবই কম। অন্যদিকে মহিলা-সদস্যবৃন্দ পুরুষদের সিদ্ধান্তের ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল এবং পারিবারিক পর্যায়ে নারীর তুলনায় পুরুষেরা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। কর্মক্ষেত্রেও নারীর তুলনায় পুরুষেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, মহিলারা মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের সিদ্ধান্তের প্রতি অধিকতর আস্থাশীল।

৪.৮ উন্নয়ন ও জাতি গঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের চেতনা-লালিত বিশ্ব থেকে মূলত নারীর পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। সেকালে নারী বড়জোর গৃহবধূ হিসেবে বিবেচিত হ'ত। তাদের সামর্থের কোন স্বীকৃতি ছিল না, তাদের স্থৈতিকতা

৫০ Haque, A. K. M. Hedayatul and Bala, Hiralal (1988) : Women in the Bangladesh Civil Services, Bangladesh Public Administration Training Centre, Savar, Dhaka, p. 54.

৫১ ibid, p. 56.

৫২ op cit, p. 67.

হ'ত চরমভাবে অবহেলিত। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সমাজের মানুষের মধ্যে অবিচার ও জেন্ডার-বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, বিশেষত নারীর ভোগান্তি সম্পর্কে বর্ধিষ্ণু সচেতনতার জন্ম নিচ্ছে। এ সকল দীর্ঘ ভোগান্তি অতিক্রম করে নারীরা ক্রমশই তাদের পূর্ণ স্থৈতিকতা নিয়ে জেগে উঠছে। জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে তারা তাদের দক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে প্রমাণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু মৌলবাদী ও নব্য-মৌলবাদীদের পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ-পদ্ধতি তাদের এই প্রতিশ্রুতিশীল নব-জাগরণের পথে প্রায়শই বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে[৫৩]। এমন অসংখ্য বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মহিলারা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। উন্নয়নমুখী এনজিও-সমূহ, নারীবাদী সংস্থাসমূহ, সামাজিক সংগঠনসমূহ প্রভৃতি এক্ষেত্রে নারীদের উদ্বুদ্ধকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। সরকারও উন্নয়ন এবং জাতি গঠন কার্যক্রমে নারীর বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে সমাজের বেশিরভাগ লোকের মধ্যে এখনো জাতীয় উন্নয়নে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণকে মেনে নেয়ার মত মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক (formal and informal) সেক্টরে নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকার স্বীকৃতিও জেন্ডার-বৈষম্যকে ব্যাপকভাবে (drastically) কমিয়ে আনতে পারেনি[৫৪]।

কিছু নির্বাচিত জাতি গঠন কার্যক্রমে—যেমন, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহিলারাও এ ধরনের অবস্থা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আত্ম-প্রত্যয়ী নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নে এবং মহিলাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে দেশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৯ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

কোন সমাজে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে UNDP কর্তৃক উদ্ভাবিত GEM সূচক নির্দেশ করে যে, একই ধরনের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পন্ন অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি[৫৫]। বাংলাদেশের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বর্তমান অবস্থানের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিংশ শতাব্দির শুরুতে বঙ্গীয় নারী

---

৫৩ Guhathakurda, Meghna and Begum, Suraiya (1995) : Political Empowerment of Women's Movement. In : Empowerment of Women : Nairobi of Bejing (1985-1995) : Women for Women, Dhaka, p. 41.

৫৪ Hossain, Hameeda (1999) : Women in Politics. In : Ahmad, Mohiuddin (ed.). : Bangladesh Towards 21st Century, Community Development Library, Dhaka, p. 177.

৫৫ UNDP : Human Development Report 2000. Oxford University Press, New York, 2000, pp. 172-173.

সমাজ ভোটাধিকার প্রয়োগে নারীর লিঙ্গীয় বৈষম্য দূরীকরণের সমর্থনে এবং নারীর প্রাধিকার (entitlement) নিশ্চিতকরণে এগিয়ে আসে[৫৬]। বাংলার নারী আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা ছিল মূলত সমাজের উচ্চ-স্তরের সুশিক্ষিত মহিলা, যারা ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যাপক আধিপত্য সম্পন্ন অবস্থান ভোগ করছিল এবং সমাজে যাদের উচ্চ ধর্মীয় অবস্থান ছিল[৫৭]। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এদেশের নারী সমাজ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর ভোটাধিকার ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকারসহ সমাজে তাদের সম-অবস্থান এবং সম-অধিকারের নিশ্চিয়তা বিধান করা হয়েছে। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাস্তবত নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্যেই মূলত সীমিত রয়েছে। রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধুমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিবারগুলোর মধ্যেই সীমিত রয়েছে[৫৮]। মহিলা ভোটাররা মনে করেন এবং প্রায়শই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা "বেশি আন্তরিক, পরিশ্রমী, সৎ ও অকপট এবং নীতিবোধসম্পন্ন" এ কারণে আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় তাঁরা একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাঁরা সমাজে নারীর অবস্থানের উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যুসমূহের ব্যাপারে অধিকতর কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তৃণমূল পর্যায় থেকে এমন কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসছে না।

নব্বুইয়ের দশক থেকে উন্নয়ন চিন্তা-চেতনায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক নীতির বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের বিবেচনাটি বর্ধিষ্ণু চাহিদা আকারে উপস্থাপিত হতে থাকে। বাংলাদেশ (ক) The Plan of Action (Mexico 1975), (খ) The Forward Looking Strategies (Nairobi 1985) ও (গ) The Beijing Plan of Action (1995) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কৌশলপত্রে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের UNCEDAW অনুমোদন করার কারণে জন-সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দেশের সংবিধানও এ প্রতিশ্রুতিকে পুনর্নিশ্চিত করে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ তৃণমূল পর্যায়ের জন-জীবনে নারীর দৃশ্যমানতাকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর অবস্থান "…. have remained outside the play of power politics. Their visibility in popular struggles for democracy, in election campaigns and in community work has not been translated into greater

---

৫৬ Southard, Barbara (1996) : The Women's Movement and Colonial Polittics in Bengal 1921-1936. University Press Limited, Dhaka, pp. 72-74.

৫৭ Ibid, pp. 43-47.

৫৮ Maitra-Sinha, Anjana (1993) : Women in Changing Society. Ashish Publishing House, New Delhi, pp. 58-59.

influence in the public domain. Only a small number have been able to enter positions of public decision-making. Their dependence upon traditionally powerful structures within the national political structures has limited their role as cheerleaders. ....[৫৯]" ।

তুলনামূলকভাবে ছাত্র-রাজনীতিতে নারী অধিকতর দৃশ্যমান[৬০] হলেও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জাতীয় রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। স্বাধীনতাত্তোর কাল থেকে সংসদে নারীর অংশগ্রহণ কখনোই ৩.০%-এর বেশি হয়নি। এক সময় সংসদের জন্য সংবিধানে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংস্থান থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাদেরকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে বিরত রেখেছে[৬১]। বর্তমান সংস্থানের আলোকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের বাস্তব কার্যকারিতা কি হবে ভবিষ্যতই এর প্রমাণ দেবে।

বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষেরা সাধারণত তাদের প্রতিপক্ষ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে খুবই উদার। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব পরিবারের নারী সদস্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। নিজস্ব পরিবারের নারী সদস্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের নারী সদস্যদের মধ্যেও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন, পুরুষেরা রাজনৈতিক কার্যক্রমে অধিকতর দক্ষ। তাঁরা ঝুঁকি গ্রহণে, চাপ (stress) ব্যবস্থাপনায়, রাজনৈতিক শক্তি পরিচালনায়, রাজনৈতিক দুরবস্থা (hazards) মোকাবেলায়, রাজনীতিতে শক্তি সংগঠনে ও সঞ্চয়নে নারীর তুলনায় অধিকতর সমর্থ এবং তারা খুবই দক্ষতার সাথে রাজনৈতিক লড়াই পরিচালনা করতে সক্ষম।

শক্তির রাজনীতি (power politics) এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের নীরব ও বর্ধিষ্ণু ভীতির সঞ্চার ঘটছে, সেখানে নারী নিজেকে উপযুক্ত অথবা স্বস্তিকর নাও মনে করতে পারে। সন্ত্রাস ও রাজনীতির নোংরা খেলা সাধারণ্যে এ ধরনের অনুভব ও ভীতি সঞ্চারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। বিদ্যমান অবস্থায় নারীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পদ্ধতির মত—যেখানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে—

---

৫৯ Hossain, Hameeda (1999) : Women in Politics. In : Ahmad, Mohiuddin (ed.). : Bangladesh Towards 21st Century, Community Development Library, Dhaka, p. 178.

৬০ Guhathakurda, Meghna and Begum, Suraiya (1995) : Political Empowerment of Women's Movement. In : Empowerment of Women : Nairobi to Bejing (1985-1995), Women for Women, Dhaka, p. 37.

৬১ op cit, p. 181.

তদ্রূপ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার জন্য একটি জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৪.১০ বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে নারীর বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার যৌতুকের (স্ত্রী-ধন) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সন্তানহীন বিধবা নারীর জীবদ্দশায় তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনের ওপর একটি ভোগাধিকার ছিল। তরুণী বিধবা, বিশেষত যারা পুরুষ সন্তানহীন, তারা পরিবারের অপ্রত্যাশিত বোঝা হিসেবে বিবেচিত হ'ত। যদিও যৌতুক প্রথাকে একটি অশুভ অনুশীলন (সামাজিক ব্যাধি) হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এ সমস্যার উত্তোরণে যৌতুক বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে, তথাপি যৌতুকের অমানবিক অনুশীলন হরদম চলছে[৬২]। অন্যদিকে মুসলিম আইনে কন্যা-সন্তান পুত্র-সন্তানের অর্ধাংশ বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার ভোগ করার বিধান থাকার কারণে তাত্ত্বিকভাবে মুসলিম নারীদের বৃহত্তর সম্পদাধিকার রয়েছে[৬৩]।

বিদ্যমান বংশানুক্রমিক সম্পদাধিকার ব্যবস্থার প্রশ্নে সমাজে মত-পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যমান সম্পদাধিকার আইন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই যথার্থ বিধায় অনেকে প্রচলিত পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। বর্তমান সমীক্ষাধীন উত্তরদাতাদের অভিমত হলো, মহিলারা তাদের মাতা-পিতা ও স্বামী উভয় পক্ষ থেকেই সম্পদের অংশীদারিত্ব পায়, সুতরাং সম্পদাধিকারের বিদ্যমান পদ্ধতি যথার্থভাবে সঠিক আছে। কিন্তু যাঁরা বিদ্যমান পদ্ধতি সঠিক নয় বলে মনে করেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ঃ

* যেহেতু মাতা-পিতার দৃষ্টিতে জেন্ডার-নির্বিশেষে সকল সন্তানই সমান, সেহেতু সম্পদ বিতরণ সমভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* যেহেতু মেয়েরা তাদের মাতা-পিতার অধিক যত্ন নেয় এবং যেহেতু তারা জীবনের প্রতিটি স্তরে দুর্বল, সেহেতু তাদের অধিক সম্পদের প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত মতাদর্শের আলোকে তাঁরা সম্পদ বণ্টনে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান সম্পদাধিকার পদ্ধতির যথোপযুক্ত আঙ্গিকে সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.১০ প্রাধিকার ও ক্ষমতায়ন

UNDP কর্তৃক নিরূপিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, যেকোন সমাজ ব্যবস্থায় আয়-স্তর ও জেন্ডার-বৈষম্যের মধ্যে কোন গাণিতিক সম্পর্ক নেই। তার অর্থ হচ্ছে, জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি উচ্চ আয়ের সাথে

---

৬২ Maitra-Sinha, Anjana (1993) : Women in Changing Society. Ashish Publishing House, New Delhi, pp. 11-16.

৬৩ Southard, Barbara (1996) : The Women's Movement and Colonial Politics in Bangal 1921-1936. University Press Limited, Dhaka, p. 45.

সম্পর্কিত নয়। UNDP-'র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০০০ অনুসারে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নরওয়ের অবস্থান প্রথম, যেখানে বিশ্বের অনেক দেশের আয়-স্তর নরওয়ের থেকে অনেক বেশি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের জেন্ডার-ক্ষমতায়ন অবস্থা অনেক ধনী ও উন্নত দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল[৬৪]। উদাহরণত জেন্ডার মতায়নের ক্ষেত্রে বারবাডোসের অবস্থান সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং বেলজিয়ামের তুলনায় ভাল; আবার ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং ইরিল্যান্ডের অবস্থান যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভাল; বাহামাসের অবস্থান পর্তুগাল ও স্পেনের তুলনায় ভাল। এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বল্প-আয়ের দেশগুলোতেও জেন্ডার-ক্ষমতায়ন সম্ভব। বাংলাদেশের GEM-অবস্থা একই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশ ভাল।

প্রকৃত পক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন একটি ধারণা, যা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত ইস্যুর সমন্বিত কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে। NFS (Nairobi Forward Looking Strategies) ও CEDAW'র উদ্যোগী স্বাক্ষরদাতা হিসেবে এবং দ্বান্দ্বিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে (having conflicting socio-cultural matrix) বাংলাদেশ কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপকভিত্তিক মূলনীতিমালার পরিকল্পনা করছে, যেখানে নারী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হবে না, বরং তাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। বর্তমানে মহিলাদেরকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং সমাজের সকল পর্যায়ের—পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ের—সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হচ্ছে[৬৫]। নির্বাচনী ও প্রতিনিধিত্বকারী রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে[৬৬]। এটি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের পরিচায়ক। এছাড়া ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে, বিশেষত নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলাদের প্রান্তিক অবস্থার অনেক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। গৃহবধূ থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের মহিলারা তখনকার বিক্ষুব্ধ রাজনীতিতে অংশ নিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ আন্দোলনটির পুরোভাগে ছিল তিনটি জোট-শক্তি, যার দু'টির নেতৃত্বে ছিলেন দুই নেত্রী। যদিও উভয় নারীই রাজকীয় সম্পর্কের কারণে স্ব-স্ব দলের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, দলীয় নেতৃত্বে শক্তহাতে হাল ধরা এবং দলকে ভাঙ্গনের মুখ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁরা উল্লেখযোগ্য দক্ষতা/সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

৬৪ Rahman, Shaheen (1998) : About Gender and Development. Steps Towards Development, Dhaka, p.11.

৬৫ Choudhury, Dilara (1998) : Women's Participation in the Formal Structure and Decision-Making Bodies in Bangladesh. In : Empowerment of Women: Nairobi to Beijing (1985-1995), Women for Women, Dhaka, pp. 2-4.

৬৬ op cit, p. 7.

এছাড়া বিএনপি ও আওয়ামী লীগে বেশ ক'জন নারী রাজনীতিবিদের সমাবেশ ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের যোগ্যতা, সফলতা ও দক্ষতার মাধ্যমে রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে সমর্থ হয়েছেন। ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ৩৬-৪০ জন মহিলা প্রার্থী—১৯৮৬ সালের দ্বিগুণ—বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের DWAN (Development Alternatives with Women for a New Era) দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় এনে বর্তমান সমীক্ষায় শুধুমাত্র সংকীর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে নয়, বরং (ক) সমাজের বিভিন্ন শক্তি-ভিত্তিতে (power-bases) ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং (খ) তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন ও আত্মপোলব্ধির জাগরণের (conscientization) ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণাটি অত্যন্ত নতুন। WID (Women in Development) ধারণাটি বাংলাদেশে UN Women's Decade from ১৯৮৫-১৯৯৫ 'র প্রাক্কালে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিও-দের তৃণমূল আন্দোলন ও আত্মপোলব্ধির জাগরণ কর্মসূচি একটি সামাজিক সেবা-কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এটি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি সক্ষম ও শক্তিশালী কৌশল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেখানে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যান্য ইস্যুসমূহ যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, গ্রামীণ ঋণ ও আয়-উপার্জন, শিক্ষা, ওকালতি (advocacy), দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং আত্মপোলব্ধির জাগরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারও VGFP (Vulnerable Group Feeding Programme), Rural Credit Progamme, PLAGE ইত্যাদির মত অনেক নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শহর ও গ্রামীণ উভয় পরিবেশেই মহিলারা প্রায়শই বর্ধিষ্ণু হারে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে এবং অপ্রচলিত কার্যক্রমকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে[৬৭]। এগুলো সবই নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক।

সমাজে নারীর আইনগত অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা সাধারণত পুরুষের অধীনস্ত বা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবারে এবং সমাজে নারীর বাঁধা-ধরা ভূমিকা সম্পর্কে বিদ্যমান প্রচলিত ধারণাই তাদের এই অধস্তন-ভাবমূর্তিকে আরো অধিকমাত্রায় সঙ্গিন করে তোলে। সমাজে নারীর এই অধস্তন অবস্থানের জন্য আর্থ-সামাজিক ও আইনগত পরিসরে নারীর প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার, পুরুষবাদী, স্বাতন্ত্রিক এবং

---

৬৭ Huq, Jahanara (1995) : Empowerment of Women in Bangladesh : The Rural Scenario. In : Empowerment of Women : Nairobi to Beijing (19985-1990), Women, Dhaka, pp. 62-65

পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত দায়ী। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের মহিলারা পশ্চিমা সভ্যতায় বিদ্যমান নারী-অধিকারে বিশ্বাসী নয়। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার সম্পর্কে তাদের নিজস্ব এবং স্বাতন্ত্রিক ধারণাগত বিশ্বাস রয়েছে, সেটা সমাজে তাদের শান্তিপূর্ণ, নির্ভরশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য জীবন-যাপনে নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য।

সমাজে এ ধরনের বিশ্বাস অত্যন্ত প্রকট। প্রকৃতপক্ষে প্রাধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বৈষম্যই তাদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। মূলত অশিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দারিদ্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপলব্ধিই সমাজে নারীর পশ্চাৎপদতার মূল কারণ। নারীর পশ্চাৎপদতার কারণে শিক্ষিত সমাজের অনেকে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন। তাঁরা নারী শিক্ষার জন্য বর্ধিত সুবিধাদি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র বিমোচন, যথার্থ ধর্মীয় জ্ঞানের আলোয় মানুষকে উদ্ভাসিত করা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাঁরা নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্তি এবং আইনগত প্রথার আধুনিকায়নের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

৪.১১ প্রজননাধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য

বাংলাদেশে "প্রজনন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য" বহুল আলোচিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে মহিলাদের নিজেদের আগ্রহও কম। আমাদের প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা এ বিষয়াবলী উন্মুক্ত আলোচনা ও শিক্ষাদানে সমর্থন দেয় না। সাম্প্রতিক সময়ে শহর এলাকার, বিশেষত রাজধানী শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারী সমাজের মধ্যে "প্রজনন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য" সম্পর্কিত ধারণাটির পক্ষে জোরালো বক্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে[৬৮]।

কোন সমাজের প্রজনন স্বাস্থ্যাবস্থা সমাজটির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। জেন্ডার-নির্দিষ্ট কাম্য পুষ্টির অভাব, নিরাপদ পানি ও পয়ঃ সুবিধাদিতে নিম্ন প্রবেশাধিকার, নারীর অধস্তন অবস্থান এবং পরিবেশগত বিপন্নাবস্থা কোন সমাজের সামগ্রিক প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন ব্যক্তির জীবন-যাপন প্রণালী বা জীবনাচরণ, বিশেষত তার যৌন-জীবনাচরণ পদ্ধতি প্রজনন স্বাস্থ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাবলীর প্রাপ্যতা, ব্যবহার এবং ফলপ্রসূতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান সমীক্ষায় প্রজননাধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের কারিগরী বিষয়াদির পরিবর্তে সমাজে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

---

৬৮ Akhter, Farida (1994) : Reproductive Ringhts : A Critique from the Realities of Bangladesh Women. In : Jahan, Roushan et al ed. : Reproductive Rights and Women Health, Women for Women, Dhaka, p. 46.

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিগত ২-৩ দশক ধরে বাংলাদেশে প্রজনন হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পূর্বের তুলনায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অধিক ব্যবহার এ অর্জনের মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। আমাদের দেশে প্রজনন অক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি প্রকট। এগুলো নিরূপণ এবং তার চিকিৎসা সুবিধার অপ্রতুলতাও প্রকট। দেশে অর্থবহ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশের গর্ভকালীন শিশু মৃত্যুর হার প্রায় ১৫০ গুণ[৬৯]। সাধারণভাবে বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব খারাপ।

প্রজননাধিকার সম্পর্কিত ধারণাটি বাংলাদেশে খুবই নতুন। সাধারণভাবে এ অধিকারের অর্থ হচেছ, নিজের শরীর ও প্রজননাচরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণভাবে নারীর। প্রজননাধিকার নিজের প্রজনন ক্ষমতার ওপর একজন নারীর ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। এ ধারণাকে আরো সম্প্রসারিত করে নারীর সামগ্রিক মনোস্তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মহিলারা প্রায়শই ইস্যুটিকে অধিকতর স্পর্শকাতর করে তোলেন। এ ধারণাটিতে নারীর রাজনৈতিক শৃঙ্খল-মুক্তির প্রশ্নকে অন্তর্ভুক্ত করে না। পশ্চিমা সভ্যতার কৃষ্টি-লালিত নারীর মত বাংলাদেশের একজন নারীর কাছে "প্রজনন অধিকার" শব্দটি একই অর্থ বহন করে না।

বাংলাদেশের নারী-জীবন অপরের কর্তৃত্বাধীন। পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি এমন কি দাতা সংস্থাসমূহও বাংলাদেশের নারীর প্রজননাধিকার ও প্রজননাচরণের ওপর তাদের স্ব-স্ব কর্তৃত্ব আরোপে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ষাটের দশক থেকে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নীতি হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। নারীর প্রজননাধিকারের ওপর বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুতরাং প্রজননাধিকার বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রকদের একটি সুস্পষ্ট ছদ্মবেশ। এমন কি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে প্রজননাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, বিয়ের পর একজন নারীকে তার শরীর সম্পূর্ণরূপে তার স্বামীর বেদীতে সমর্পণ করতে হবে[৭০]।

৪.১২ দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার প্রধান কারণ বিশ্লেষণ এবং তা নিরসনের উপায়সমূহ

জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব। এছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার, প্রচলিত প্রথা, সামাজিক অনুশীলন, সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত। অনেকের মতে দারিদ্র দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

---

৬৯ Akhter, Halida Hanum (1994) : Concept Presentation and Related Issues on Reproductive Health. In : Jahan, Roushan et al ed. : Reproductive Rights and Women Health, Women for Women, Dhaka. p. 9.

৭০ Jahan, Roushan et al ed. : Reproductive Rights and Women Health, Women, Dhaka. p. 86.

কারণ। তাঁরা মনে করেন যে, প্রকৃত মানসিক বিকাশের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে দারিদ্র মানুষের সামর্থকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে প্রকৃত মানসিক বিকাশের অভাবে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। নারীর মুক্ত চলাফেরার প্রতি সমাজের অগ্রহণযোগ্যতা এবং জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি পুরুষের সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব বা অহংবোধ[৭১] (ego) দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

তাঁদের মতে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী শিক্ষার জন্য বর্ধিষ্ণু সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যথার্থ শিক্ষা বা বর্ধিত শিক্ষার হার অর্জন, জীবনের সর্বপরিসরে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ, স্বাধীনভাবে নিজের চাকুরি জীবন (career) বাছাইয়ের সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনগত সহায়তাদান, উদ্বুদ্ধ-করণের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়ন ইত্যাদি জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, প্রণোদনা, মহিলাদের সম-জন্মাধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদিও এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

৫.০ নীতি-পরামর্শসমূহ ও উপসংহার

৫.১ নীতি-পরামর্শসমূহ

মানব সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে জেন্ডার-ইস্যুসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো এখনো গ্রন্থিল বা ঝামেলা-পূর্ণ। জেন্ডার-ইস্যু সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে আমাদের সমাজকে এখনো অনেক পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের দেশে বিদ্যমান স্থূলকায় জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমান গবেষণায় বেশ কিছু পদক্ষেপ ও নীতি-সুপারিশ পরামর্শিত হয়েছে, যা সমস্যার উত্তোরণে অনেক সহায়ক হবে। সুপারিশগুলো গবেষণার ফলাফল ও চিহ্নিত কৌশলগত দৃষ্টিকোণের আলোকে নিম্নরূপ পরামর্শিত হলো ঃ

* জেন্ডার-ইস্যুসমূহ অধিকতর ভালভাবে বোঝার জন্য এবং সমাজ ও জাতির ওপর তার বহুমুখী ইতিবাচক প্রভাব সঞ্চালনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

* সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার-প্রাধান্য দূরীকরণে মহিলারা যাতে মা-বাবা, সন্তান ও পরিবরাকে পুরুষের মত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হয়

---

৭১ Here psychology or ego refers to one's negative mental make-up towards gender issues. In a patriarchal society like Bangladesh, there are many males who are not mentally ready to tolerate/accept women's superiority over them. even if a woman can prove herself to be superior than the males in a particular society.

তার জন্য উন্নয়নে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লাগসই আইনগত কাঠামো (appropriate legal framework) সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

* জীবনের সকল পরিসরে নারীর অবদানকে আইনগতভাবে, সামাজিকভাবে এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া বাঞ্ছনীয়। উদ্বুদ্ধকরণ, প্রণোদনা ও উপদেশনার মাধ্যমে পুষ্টি-অবস্থান (nutritional status) পুনর্গঠনে একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক।

* দেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পুষ্টি-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

* নারীর অবস্থানের পূর্ণ অগ্রগতি সাধনে এবং উন্নয়নে শিক্ষাকে তাদের মৌলিক অস্ত্র (basic tool) হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

* স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে জেন্ডার-বৈষম্য সৃষ্টি সামাজিক এবং আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে নারীর প্রতি বিনামূল্যে অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

* চিকিৎসা, শিক্ষকতা, নার্সিং, ডে-কেয়ার সার্ভিসেস, সাচিবিক কর্ম, তথ্য প্রযুক্তিসহ কম্পিউটার, টেলিফোন অপারেটিং, ব্যাংকিং ইত্যাদির মত কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নারীর চাকুরি সুবিধা প্রদানে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নের জন্যও পর্যাপ্ত এবং যথার্থ সুবিধা সম্প্রসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

* কর্মজীবী মহিলাদের কর্মস্থলে অধিকতর নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোন ধরনের হয়রানি বা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অধিকতর নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নিশ্চিয়তা বিধান করতে হবে।

* পারিবারিক ও কর্ম-অবস্থানে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অধিকতর স্বাধীনতা সম্প্রসারণ করা উচিৎ।

* সমাজে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নে এবং উন্নয়ন ও জাতি গঠন কার্যক্রমে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে দেশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত এবং অনুসৃত হওয়া দরকার।

* দেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় এবং অন্যান্য পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসৃত হওয়া

বাঞ্ছনীয়, যার মাধ্যমে তাদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংস্থানকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনের মত অধিকতর নিরাপদ পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব।

* "নারীর ক্ষমতায়ন"কে জেন্ডার-ইস্যুর একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এটিকে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত ইস্যুর সাথে সমন্বিত একটি প্যাকেজ-বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

* জাতীয় কৌশলগত কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাসমূহকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধ পদ্ধতির পরিবর্তন আনয়নে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

* দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মানব ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, প্রণোদনা ও পরামর্শ প্রদান (counseling) জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণের মৌলিক কৌশল হিসেবে অনুসৃত হওয়া উচিৎ।

* বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নার্সিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য সম্প্রসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

* কর্ম-পরিবেশে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা উচিৎ। এ ধরনের উৎসাহ প্রদান তাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটাবে।
* সরকার জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত প্রজননাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিৎ। নিবিড় উদ্বুদ্ধকরণ (motivation), সচেতনতা বৃদ্ধি (conscientization), ওকালতি (advocacy) ও পরামর্শ প্রদান (counseling) এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫.২ উপসংহার

জেন্ডার-ইস্যুসমূহ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা ধারণ করে। একারণে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে সম্বোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জেন্ডার-সমতা, সহমর্মিতা ও সাম্য নিশ্চিতকরণে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য এজেন্ট হিসেবে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদেরকে এবং যাঁরা নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি

জেন্ডার-বন্ধুসুলভ হওয়া দরকার। জেন্ডার-সমস্যাগুলো মূলত সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যাপৃত, যেখানে শিক্ষার অভাব খুবই প্রকট; ধর্মীয় কুসংস্কার এখনো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে গ্রোথিত; সাংস্কৃতিক অন্ধ-বিশ্বাসগুলো জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছে এবং দারিদ্র যেখানে মানুষের দোর-গোড়ায় কঠোরভাবে হানা দিয়েছে। একারণে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ এবং জাতি সকল পর্যায়ে এ সমস্যাগুলোকে একান্ত নিজস্ব সমস্যা মনে করে সংশ্লিষ্ট পরিসরে ফলপ্রসূ উদ্বুদ্ধকরণ, প্রণোদনা ও আত্মপোলব্ধির জাগরণী কৌশল (conscientization strategies) গ্রহণের প্রয়োজন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (1998): Towards Gender Equity : Poverty, Rights and Participation. CIRDAP, Dhaka.

Halder, Nilratan : Women in the Army : A Big Breakthrough in Gender Equity. Observer Magazine, Friday, July 28, 2000, Dhaka, 2000.

Rahman, M. Safiur and Imam, Kazi Hasan (1993) : Need Assessment of Population Training for the participants of the Foundation Training Course. BPATC, Savar, Dhaka.

Singh, Karan (1992). : Population, the Forgotten Factors. In : The Indian Journal of Public Administration, IIPA, Vol. XXXVIII, No. 3, July-Sept., 1992.

The Government of the People's Republic of Bangladesh : Bangladesh Constitution. Dhaka, p. 8. Part-III.

The Government of the People's Republic of Bangladesh (1998) : The Fifth Five Year Plan 1997-2002. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka.

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটির নির্বাচিত মূল্যায়নকারীর উপদেশনার আলোকে পাদটীকায় প্রদর্শিত পুস্তক/প্রকাশনা নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা
জুন-২০০২/ জ্যৈষ্ঠ-১৪০৯

বাংলাদেশে নারী-ক্ষমতায়নের উৎস ঃ একটি মতামত ভিত্তিক পর্যালোচনা

রায়হানা আখতার জাহান *
ড. রেজা হাসান মাহমুদ **

Abstract : Women empowerment is the most important and pronounced issue of the present world. It is not only important for women development but also a prime step to face the problems of the world. The empowerment of women is to develop women's potentiality to control their own life, position and environment to a greater extent. This paper is an attempt to reveal the sources of women empowerment. Data has been collected from purposively selected personnel of the society through specific questionnaire and observed that all the respondents have accepted women's education as the prime source of women empowerment and after that imtelligence, personality, ability to participate in decision making process are inportant. Most of them have not accepted the factors like women's age, beauty, ownership of assets etc. Besides, they have advocated for some related factors like women's personal saving, heath consciousness, moral character, honesty, regards to respected persons, affections to younger and maintaining courtesy in case of dress etc., are necessary. From the overall discussion it is clear that a single factor may not be the source of women empowerment, the total striking issues of their life are the sources of women empowerment.

ভূমিকা

'নারী-ক্ষমতায়ন' বিশ্বব্যাপী একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান চলে আসছে। তা সত্ত্বেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক বিবর্তনের ফলে কখন কিরূপ ধারণ করেছে, ভবিষ্যতে কিরূপ ধারণ করবে এবং কার্যকর টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে যথেষ্ট মত-পার্থক্য রয়েছে। তবে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারীর অবস্থান ও অবস্থার উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা সর্বত্রই স্বীকৃত (করিম, ২০০০:৮০)।

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। শুধু নারীর উন্নয়নের জন্য নয়, পৃথিবী এখন যে সকল সমস্যার মুখোমুখি, সেগুলোর সমাধানের প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নকে। তা সে সমস্যা পরিবেশ বিপর্যয়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র বা নিরক্ষরতা-যাই হোক না কেন। ক্ষমতায়ন শব্দটির উৎস ক্ষমতার সাথে, বিশেষ করে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী সরকারি কলেজ।
** জুনিয়র ইন্‌স্ট্রাক্টর, ব্যবস্থাপনা, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। মূলত ভৌত, মানবিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের দ্বারা পুরুষতন্ত্র ও এ ধরনের সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে (এসিডি, ২০০২: ৪)।

ক্ষমতায়ন ও নারী-ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন অর্থ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে-সব বিদ্যমান কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাৎপদ অবস্থায় রাখে, তা থেকে উত্তরণ। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক...বলেছেন, "Empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation to greater decision making power and control, and to transformative action" (Karl, 1995 : 14).

নারীর ক্ষমতায়ন এই নয় যে, যারা ক্ষমতার চেয়ারে বসে আছেন, নারীরা তাদের সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসবেন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এখানে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে (চৌধুরী, ১৯৯৫:২৬)। অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণই ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতাহীনতা মহিলাদের অধিক দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ। অপর দিকে দারিদ্র্যের কারণেও মহিলারা ক্ষমতাহীন হয়। তাই নারী-ক্ষমতায়নের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দারিদ্র্যেকেই চিহ্নিত করা হয়। তবে ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিক রূপ নয়, যাকে অনেকেই ক্ষমতায়নের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বচ্ছলতা এবং সুখ-সমৃদ্ধি সম্পর্কে নিজের অনুভূতির আলোকেও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যায়। বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের ভাষায়, একজন ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বোঝা যাবে যদি তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যা তিনি হতে চান বা করতে চান তা হতে পারেন (যেমন-পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত হওয়া, অকালমৃত্যু যতদূর সম্ভব রোধ করা, লেখাপড়ার পর্যায় বৃদ্ধি, অধিকভাবে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার, কোনোরূপ জড়তা ছাড়া সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে ইত্যাদি) ও সেই সুযোগসমূহ তার কাছে খোলা থাকে (আহমেদ, ২০০০:৪৭)।

১৯৯৫ সালে বেইজিং এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের মোট ১৮৯টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন

নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই, নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া প্রক্রিয়া হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং একটি অবিভাজ্য ধারণা। এ ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজনীয় শর্ত হয়, তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি নীতি-নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে নারী সচেতন হলেও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সুতরাং প্রকৃত অর্থে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় ও মজবুতকরণে সচেষ্ট হবে (সুলতানা, ১৯৯৮: ৪৭)।

আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস অনুসন্ধান। এই লক্ষ্যে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের ৫০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। এঁদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচিত উত্তরদাতারা হলেন, ১০ জন ডাক্তার, ১০ জন শিক্ষক, ১০ জন আইনজীবী, ১০ জন প্রকৌশলী ও ১০ জন রাজনীতিবিদ। উত্তরদাতাগণ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস হিসেবে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. শিক্ষা

শিক্ষাকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন। গবেষণার জন্য নির্বাচিত ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনজীবি ও রাজনীতিবিদগণের সকলেই (১০০%) একমত যে, শিক্ষাই নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে কোনো মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি অতি অপরিহার্য বিষয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি শিক্ষার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো তাহলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মর্যাদাহীন করে সংকুচিত ও নিষ্ফল জীবন-ধারার মধ্যে না ঠেলে দিয়ে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সাধন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হতো (খাতুন, ১৯৯৮: ১৩)।

আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ নারীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণে পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরশীলতাই নারীকে পরাধীন করে রাখে। শিক্ষা নারীকে এই পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে। দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরও সমান

হারে অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক। নারীর সচেতনতা সৃষ্টি না হলে এই অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। সুতরাং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যে নারী-শিক্ষার প্রয়োজন, সারা বিশ্ব আজ এ কথা উপলব্ধি করেছে। আমাদের বাংলাদেশেও এর ছোঁয়া লেগেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ফিডার স্কুল, নারীশিক্ষা কেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষা ছাড়া নারী-সচেতনতা সম্ভব নয়। আর নারী সমাজ সচেতন না হলে তাদের ক্ষমতায়নও আশা করা যায় না।

খ. উপার্জনমূলক কাজে নারীর সম্পৃক্ততা

আমাদের দেশের মহিলারা সাধারণত পরিবারের যাবতীয় গৃহকর্ম করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের মহিলারা শিশু থেকে শুরু করে রান্না-বান্না, ঘরদোর ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার, গবাদিপশু পালন, বিভিন্ন ফসল মাড়াই, ধান সেদ্ধ করা, শুকানো এবং প্রয়োজনে ঢেঁকিতে ধান ভানা, জ্বালানী সংগ্রহ ইত্যাদি সব কাজই করে থাকে। এতদসত্ত্বেও এসব কাজ থেকে পরিবারে যেহেতু অর্থ-সমাগম হয় না, তাই তাদের এসব কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নেই। তবে যেসব মহিলা কোনো না কোনো উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত, পরিবারে তাদের বেশ মর্যাদার সাথে দেখা হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০% ডাক্তার, ৫০% প্রকৌশলী, ৭০% শিক্ষক, ৮০% আইনজীবী এবং ৪০% রাজনীতিবিদ উপার্জনমূলক কাজে নারীর সম্পৃক্ততাকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত একজন মহিলা পরিবারের অন্যান্য মহিলা এমনকি পুরুষ সদস্যদেরও বিভিন্ন ব্যাপারে খবরদারি করতে পারে বলে-উত্তরদাতাদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন। সুতরাং উপার্জনমূলক কাজে নারীর সম্পৃক্ততা নারী-ক্ষমতায়নের অন্যমত একটি উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

গ. বুদ্ধিমত্তা

বুদ্ধিহীন বা নির্বোধ মানুষ পরিবারে ও সমাজে সর্বত্রই অবজ্ঞার পাত্র। বুদ্ধিমত্তার জন্যই মানুষ ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের অধিকারী হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা মানুষকে কলুষমুক্ত জীবনের সন্ধান দেয়। বুদ্ধিমত্তা মানুষকে সাফল্যের সোনালী পথের দিশা প্রদান করে। নারী-ক্ষমতায়নের উৎস হিসেবে তাই নারীর বুদ্ধিমত্তাকে অন্যতম একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নির্বাচিত উত্তর দাতাদের মধ্যে ৯১% ডাক্তার, ৬০% প্রকৌশলী, ৮০% শিক্ষক, ৭০% আইনজীবী এবং ৯০% রাজনীতিবিদ নারীর বুদ্ধিমত্তাকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে মতামত প্রদান করেছেন।

ঘ. ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ববান মানুষকে সকলেই সমীহ করে। এখানে নারী পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলাকে পরিবারে এবং সমাজেও বেশ ভালো চোখে দেখা হয়। পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের বেশ মূল্যায়ন করা হয়। কারণ একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহিলা কখনোই কোনা ব্যাপারে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না, কাউকে কখনো হয়রানির চেষ্টা করে না, বরং যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত ব্যক্ত করে থাকে। সুতরাং নারীর ব্যক্তিত্বকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যমত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ৭০% ডাক্তার, ৬১% প্রকৌশলী, ৯০% শিক্ষক, ৭০% আইনজীবী এবং ৮০% রাজনীতিবিদ নারীর ব্যক্তিত্বকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে অনেক উত্তরদাতাই বলেছেন যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলারা সমাজের কোনো ব্যক্তির বিপদ-আপদে বা অসুখ-বিসুখের সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এরা ঝগড়া-বিবাদ পছন্দ করে না, বরং ঝগড়া বিবাদ মিমাংসায় সহায়তা করে। সমাজের অনেক কর্তা ব্যক্তিরাই প্রয়োজনে এসব মহিলাদের মতামত গ্রহণ করেন।

ঙ. বয়স

আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়স্কদের সমীহ করে। তবে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর বয়স তার ক্ষমতায়নের উৎস নয়। বয়স নারী-ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস হতে পারে। কারণ অনেক বয়স্কা নারীই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত ব্যক্ত করতে পারে না। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ৪০% ডাক্তার, ৫০% প্রকৌশলী, ৬০% শিক্ষক, ৪০% আইনজীবী এবং ৭০% রাজনীতিবিদ বয়সকে নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেছেন যে বয়স হলে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে ঠিকই তবে অনেকের ক্ষেত্রে আবার বিচার-বুদ্ধি লোপও পায়।

চ. সৌন্দর্য

প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সুন্দরের পূজারী। অর্থাৎ যে কোনো সুন্দর বস্তুকে সকলেই পছন্দ করে। প্রায় প্রতিটি পুরুষই তার সুন্দর স্ত্রীর জন্য গর্ববোধ করে। অনেক নারীর আবার তেমন চোখ ঝলসানো রূপ বা দৈহিক সৌন্দর্য না থাকলেও তাদের সৌন্দর্যবোধ রয়েছে। অর্থাৎ এরা নিজের শরীরের প্রতি যত্নশীল এবং নিজ পরিবার ও ছেলেমেয়েদের পরিপাটি করে রাখে। এ সমস্ত মহিলারা স্বভাবতই অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে আলাদা। আর সুন্দরী তথা সৌন্দর্যবোধ-সম্পন্ন মহিলাকে পরিবারের অন্যসব সদস্যরা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ মূল্য দেয়। গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% ডাক্তার, ৪০% প্রকৌশলী ও ২০% আইনজীবী নারীর

সৌন্দর্যকে নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত প্রদান করেছেন। অপরদিকে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ এ সম্পর্কে কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি।

ছ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত দানের দক্ষতা

নারী-ক্ষমতায়নের মূল উৎস হচ্ছে তার পরিবার। কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য এবং প্রতিটি মানুষ পরিবারবদ্ধ জীবন যাপন করে। একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই সেই পরিবারের আনন্দ-বেদনা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের অংশীদার। আর এই অংশীদারিত্বই বৃহদার্থে ক্ষমতায়ন। তবে একটি পরিবারের সকল সদস্যই একই রকম মেধা-সম্পন্ন বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয়। আবার পরিবারের সকল সদস্যই একই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। সুতরাং সকল সদস্য একই রকম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না; আর তা সম্ভবও নয়। আবার পরিবারের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবাই সঠিক মতামতও দিতে পারে না। বিষয়টি নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেসব মহিলা সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত দিতে পারে, পরিবারে তাদের আলাদা ভাবে মূল্যায়ন করা হয়। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০% ডাক্তার, ৭০% প্রকৌশলী, ৮০% শিক্ষক, ৯০% আইনজীবী এবং ৯০% রাজনীতিবিদ বলেছেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত দানের ক্ষমতা নারী-ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম প্রধান উৎস।

জ. পিতার আভিজাত্য ও প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন

একজন মহিলার পিতার আভিজাত্য অথবা প্রভাবশালী আত্মীয় থাকলে পরিবারে ও সমাজে তাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং সমীহও করা হয়। কারণ পরিবারের যে কোনো বিপদ-আপদে বা অসুখ-বিসুখের সময়ে অভিজাত পিতা বা প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাই কোনো পরিবারের গৃহবধূর অভিজাত পিতা বা প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বাজন থাকলে তাকে পরিবারের সকলেই বেশ মর্যাদার চোখে দেখে এবং সমীহ করে। শুধু তাই নয়, পরিবারের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ রকম মহিলাদের মতামত অগ্রাধিকার পায়। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০% ডাক্তার, ৮০% প্রকৌশলী, ৪০% শিক্ষক, ২০% আইনজীবী এবং ২০% রাজনীতিবিদ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, পিতার আভিজাত্য ও প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন নারী ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস।

ঝ. পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ/যৌতুক

পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ স্বামীর সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে যৌতুক, পিতা বা মাতার সম্পত্তির অংশ, অসময়ে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণের উপর আবার স্বামীর

পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদার তারতম্য হয়। অর্থাৎ বিয়ের সময়ে যৌতুক, সময়ে-অসময়ে আর্থিক সহায়তা এবং পিতার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণের উপর স্বামীর পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা নির্ভর করে। দরিদ্র বা নিঃস্ব পিতার কন্যাকে স্বামীর পরিবারে খুব একটা মূল্য দেওয়া হয় না। পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এদের মতামত মূল্যহীন। অন্যদিকে সম্পদশালী পিতার কন্যাকে স্বামীর পরিবারে বেশ মর্যাদা দেওয়া হয়। পরিবারের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামত বেশ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% আইনজীবী ও ৪০% রাজনীতিবিদ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে ডাক্তার, প্রকৌশলী ও শিক্ষক শ্রেণীর উত্তরদাতাগণ মনে করেন যে নারী-ক্ষমতায়নের জন্য বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঞ. যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য

আমাদের সমাজে এমন অনেক মহিলা আছে, যারা ইচ্ছে করেই পরিবারের কোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় এগিয়ে আসে না-বা কোনো চেষ্টাও করে না। আবার অনেক মহিলা আছে, যারা পরিবারের যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা খুব দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে। শেষোক্ত মহিলাদের পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। পরিবারের আপৎকালে যে মহিলা নিষ্ঠার সাথে প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মতামত বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। নির্বাচিত উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৩০% ডাক্তার, ৪০% প্রকৌশলী, ৭০% শিক্ষক, ৭০% আইনজীবী এবং ৯০% রাজনীতিবিদ তাঁদের মতামতে বলেছেন যে, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি উৎস।

মতামত পর্যালোচনা

নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে, নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হলো নারীর শিক্ষা। বর্তমান সমাজ জীবনে শিক্ষা শুধু সামাজিক অঙ্গীকার নয় বরং এর প্রয়োগ এখন বাস্তবমুখী। শিক্ষা মানুষের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে একজন শিক্ষিত মানুষের আত্মসচেতনতা ও পরিবেশ সচেতনতা তীব্রতর হয়। এই তীব্র সচেতনতা মানুষকে পরিবেশজনিত অসুবিধা মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই আত্মসচেতনতা কার্যকর হলেই নারী প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হবে। তখন তারা শিক্ষাকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বাঙালি নারী সমাজ তথা সমগ্র জাতির উন্নয়নে কাজে লাগাবেন (খাতুন, ১৯৯৮ : ১৪)।

উত্তরদাতাদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারী-ক্ষমতায়নের মূল উৎস হলো নারীর শিক্ষা। আর অন্যসব বিষয়গুলো নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। একজন নারী কেবল শিক্ষিত হলেই নারী ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও অনেক উত্তরদাতা নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে আরো কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কেউ কেউ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, নারীর ব্যক্তিগত সঞ্চয় পরিবারের আপৎকালে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই নারীর ব্যক্তিগত সঞ্চয় নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কোনো কোনো উত্তরদাতা নারীর স্বাস্থ্য সচেতনতাকে নারী-ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে আবার বলেছেন, একজন মহিলার চরিত্রের স্বচ্ছতাও তার ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হতে পারে। কারণ চরিত্র হলো মানবজীবনের গৌরব মুকুট। কাজ-কর্ম, কথায়, চিন্তায়, ওঠা-বসায়, আচার-আচরণে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূতপবিত্র ভাবকেই চরিত্র বলা হয়। একজন মানুষ অন্য কোনো গুণের অধিকারী না হলেও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য পরিবারে ও সমাজে সে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সততা, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, আত্মসংযম, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, শিশুদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতি সচ্চরিত্রের লক্ষণ। চরিত্রবান ব্যক্তি মাত্রই অহিংসা, নির্লোভ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিপরায়ণ হয়। যেসব মহিলার চরিত্রের স্বচ্ছতা রয়েছে, পরিবারে ও সমাজে কমবেশি সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। শুধু তাই নয়, চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার মতামতকেও সবাই মূল্য দেয়।

অনেক উত্তরদাতা আবার পর্দাকেও নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত দিয়েছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ হলো পর্দার প্রাথমিক শর্ত। আর শালীনতাবোধ পোশাক-পরিচ্ছদই মূলত পর্দা। আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের অর্ধশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় নেতারা মূলত "বোরখা" পরিহিত মহিলাদেরই পর্দানসীন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শালীনতাবোধ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

অনেক উত্তরদাতা আবার নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল মহিলাদের পরিবারে এমনকি সমাজেও যথেষ্ট কদর রয়েছে।

উপসংহার

সার্বিক বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, একজন নারীর একক কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস নয়। একজন নারীর সার্বিক জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়গুলোই হলো নারী-ক্ষমতায়নের উৎস। আর আলোচিত বিষয়গুলোই হলো নারীর সার্বিক জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। একজন নারী সুশিক্ষিত হলেই কেবল এই বিষয়গুলো তার জীবনাচরণে ফুটে ওঠে। আমাদের মধ্যে অনেকেই 'ক্ষমতা' এবং 'ক্ষমতায়ন' বিষয় দুটি এক করে ফেলেন। কিন্তু 'ক্ষমতা' ও 'ক্ষমতায়ন' শব্দ দুটি পরস্পর পরিপূরক হলেও এর অর্থ এক নয়। তবে ক্ষমতা থেকেই ক্ষমতায়ন। কোনো নারীর ক্ষমতা না থাকলে তার ক্ষমতায়ন হয় না। আর এই ক্ষমতা নারীকে অর্জন করতে হয়। যেমন-উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত নারী তার পরিবারে এমন কি সমাজেও বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। কারণ তার উপার্জন পরিবারে আর্থিক সহায়তা করে। ফলে পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপার্জনশীল নারীর মতামতের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। আর এই উপার্জন করার ক্ষমতা লাভের জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার। প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের পরই নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ বিষয়গুলো নারীর জীবনাচরণে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

Karl, M. (1995) Women and Empowerment-Participation and Decision Making, (London : Zed Books Ltd.)

আহমেদ, তোফায়েল (২০০০) দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন : ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব (ঢাকা : ব্র্যাক)

এসিডি (২০০০) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক নারী সমাবেশ (৩রা অক্টোবর ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত) উপস্থাপিত প্রতিবেদন (রাজশাহী : অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, এসিডি)।

করিম, সিরাজুল (২০০) উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, (ঢাকা : গতিধারা)।

খাতুন, খাদিজা (১৯৯৮) "শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন" ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ২।

চৌধুরী, নাজমা ও আখতার, বেগম হামিদা (১৯৯৫) ইউনিয়ন পরিষদে নারী-প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, (ঢাকা : উইমেন ফর ইউমেন)।

সুলতানা, আবেদা (১৯৯৮) "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী-উন্নয়নের ভিত্তি : একটি বিশ্লেষণ" ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-২ং

ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা
জুন-২০০২/ জ্যৈষ্ঠ-১৪০৯

ঝিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা ঃ একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ সেলিম *
মোঃ জুলফিকার হোসেন **

Abstract : Suicide appears as a distinctly human act in all societies from the very early times. It is a social phenomenon as well as an act of individual decision. It has a lot of aspects like social, economical, psychological, legal, ethical and religious. Many components or factors are responsible for suicide at the same time. Jhenaidah is a much discussed district for abnormal tendency of suicide at the same time. Different reports editorial, sub-editorial and essay published in different local and national dailies prove its justification. Suicidal tendency was studied by analysis of forty case studies and background data of thirteen villages of Monohorpur Union under Jhenaidah district. Study indicates the causes of suicide are complicated and multifarious. Although family feud, absolute poverty, unemployment, mass illiteracy and lack of social interaction could be discerned as significant factors, further study is essential to confirm whether education, employment, women empowerment, awareness program and overall poverty alleviation could help to eradicate this tragic and dishonourable trend.

পটভূমি

মানুষের জীবনে মৃত্যু হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি। কেউ হয়তো তার জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারে; কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে মৃত্যুকে সে এড়াতে পারে না। জন্ম এবং মৃত্যু হচ্ছে একটি জৈব-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কখনও কখনও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মে না হয়ে বরং অস্বাভাবিক ভাবে হয়। আত্মহত্যা মানবজাতির একটি বিশেষ সমস্যা। অন্যকোন প্রাণী কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা অন্যকোন প্রাণীর আঘাতে মারা যেতে পারে কিন্তু কেবল মানুষই একমাত্র প্রজাতি যে নিজে নিজের প্রাণ নাশ করতে পারে। আত্মহত্যার নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আইনগত অনেক দিক রয়েছে। একটি দেশে আত্মহত্যার মাত্রা পরিমাপের একক কোন কারণ এবং মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা নেই। একই সাথে অসংখ্য উপাদান আত্মহত্যার পেছনে দায়ী। যে সকল উপদান আত্মহত্যার জন্য দায়ী সেগুলো হলো আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব, আবেগজনিত ব্যাধি যা মানুষের মাঝে অসহায়ত্ব ও অকর্মন্যতার অনুভূতির জন্ম দেয়, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা, বঞ্চনা, দীর্ঘ রোগভোগ, অপরাধবোধ, মাদকাশক্তি ইত্যাদি। এরূপ পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য, কাজকর্ম, বন্ধু-বান্ধব এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সকল আগ্রহ ও আকর্ষণ হারিয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ফেলে। নিজের চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে পায় এবং তখন আত্মহত্যাকেই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আত্মহত্যা একটি বিশেষ সমস্যা। বাংলাদেশের মধ্যে ঝিনাইদহ একটি জেলা যেখানে দীর্ঘদিন থেকেই আত্মহত্যার সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট। প্রায়শ বিভিন্ন দৈনিকে ঝিনাইদহ জেলা আত্মহত্যার প্রবণতার উপর সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। আত্মহত্যার জন্য যে কারণসমূহ দায়ী তার প্রায় সবগুলিই এ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতার পেছনে কার্যকর রয়েছে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোতে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তথাপি ঝিনাইদহ একমাত্র জেলা যা আত্মহত্যার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রচার-প্রচারণা পেয়েছে।

আত্মহত্যা কি

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে সমস্ত মৃত্যু অস্বাভাবিক নিয়মে হয়ে থাকে সেগুলোকেই আত্মহত্যা বলা হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, আত্মহত্যা হচ্ছে এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে যে ব্যক্তি ঐ কাজটি করে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। Elizabeth B. Harlock said that suicide is often intended to frighten and do cause the restraining persons into a change of attitude or behaviour towards the victim. It is also intended as a warning to loved ones an expression of dissatisfaction or displeasure with exiting unpleasant situations and as a plan for improved relationships (Harlock : 1966) অর্থাৎ আত্মহত্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গকে ভীত সন্ত্রস্ত করা এবং আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে তাদের মনোভাব ও আচার-আচরণ পরিবর্তনের কারণ সৃষ্টি করা, এর উদ্দেশ্য হল অসহনীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয়জনকে সর্তক করা এবং উন্নত বা ভাল সম্পর্কের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা। According to Durkheim, 'Serious faults in social structure lead to and increase in the suicide rates' অর্থাৎ সমাজ কাঠামোতে মারাত্মক ত্রুটি দেখা দিলে তার পরিণতি হিসাবে আত্মহত্যার হার বেড়ে যায়। গোয়েথ এর মতে আত্মহত্যা হচ্ছে,'মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচিত বিশেষ ঘটনা যা প্রত্যেক ব্যক্তির সহানুভূতির দাবী রাখে।' জেকবজিনার এর মতে, 'আত্মহত্যা হচ্ছে হতাশা, বিষণ্নতা, ক্রোধ বা প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড বা হঠকারিতামূলক প্রতিক্রিয়ার ফল।' ফ্রয়েড এর মতে, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার ও মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা আছে। কাজেই প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা সুপ্ত থাকে। (রহমান ১৯৯৮) সুতরাং উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, আত্মহত্যা হচ্ছে, যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার নিজের জীবনাবসান ঘটায় অথবা সে উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

আত্মহত্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আত্মহত্যা বা আত্মহননের ইতিহাস সম্ভবত মানব ইতিহাসের মত প্রাচীন। ইতিহাসে এমন কোন কাল নেই যখন আত্মহত্যার কোন না কোন ঘটনা ঘটেনি। অযোধ্যার মহান রাজার পরিবারবর্গ, ভাই ও শীর্ষপারিষদসহ সারজু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন দানের কাহিনী রামায়ণে উল্লেখ আছে। গ্রীস দেশের রাজার আদেশে স্বেচ্ছায় হেমলক নামক বিষপান করে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস কৃর্তক আত্মহত্যার কাহিনী অত্যন্ত সুপরিচিত। মানব জাতির ইতিহাসে বিভিন্ন গোষ্ঠী আত্মহত্যার সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, তবে তাদের বেশির ভাগই আত্মহত্যাকে একটি কাপুরুষোচিত কাজ বলে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আদর্শ প্রভৃতি মহৎ লক্ষ্যে জীবনদান করাকে পৃথিবীর সকল জাতি ও গোষ্ঠী অত্যন্ত প্রশংসার কাজ হিসেবে গণ্য করেছে। সাধারণত আত্মহত্যাকে খারাপ ও গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোন কোন লোক বিশ্বাস করে যে, আত্মহত্যার কাজটি ডাইনী বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যে স্থানে তা সংঘটিত হয় সে স্থানকে অশুভ শক্তির স্থান বলে গণ্য করা হয়।

ইসলাম ধর্মমতে আত্মহত্যাকে একটি খারাপ ও গুনাহের কাজ বলে গণ্য করা হয়। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আত্মহত্যা স্বশ্রেণীর লোককে হত্যা করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। খ্রিষ্ট ধর্মমতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ ও এক ধরনের খুন করার সামিল। হিন্দু ধর্মমতে আত্মহত্যা একটি নিন্দনীয় দুষ্কর্ম। ইহুদি ধর্মে আত্মহত্যা করা নিষিদ্ধ।

সম্প্রতি ইস্রায়েলে ইহুদীবাদী পৈশাচিকতা ও অত্যাচার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী এবং অন্যান্য আরবদেশের টগবগে তরুণ যোদ্ধাদের আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রতিবাদ কৌশল সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ধরনের আত্মহত্যাকে রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় স্বার্থে আত্মবলী বা আত্মোৎসর্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

আত্মহত্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব

এমিল দুরখেইম-এর' লি সুইসাইড (Le Suicide) শীর্ষক পুস্তক যা ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫২ সালে ইংরেজীতে অনূদিত হয়—সেটাই আত্মহত্যার উপর প্রাথমিক কাজ এবং আত্মহত্যার ঘটনা বিশ্লেষণে সমাজ বিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। দুরখেইম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আত্মহত্যা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর দলিল পত্র বিশ্লেষণপূর্বক আত্মহত্যাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ- অহংবাদী/আত্মবাদী, পরার্থবাদী ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বহির্ভূত আত্মহত্যা। অহংবাদী বা আত্মবাদী আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে যখন কোন ব্যক্তি তার সমাজ বা সম্প্রদায়ের প্রতি

কোন ধরনের বন্ধন থাকে না বা থাকলেও তা অত্যন্ত শিথিল। যেহেতু ব্যক্তির সমাজ বা সম্প্রদায়ের সংগে সম্পর্ক খুব ক্ষীন বা দুর্বল সে জন্য সে সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভালমন্দ বা মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সে কারণেই এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। শারীরিক অসুখ-বিসুখ ও মানসিক রোগের কারণে সংঘটিত আত্মহত্যাও এ ধরনের আত্মহত্যার অন্তর্ভুক্ত এ ধরনের পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন সমাজে অন্যান্য ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ড নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, যার ফলে কোন কোন ব্যক্তি নিজেদেরকে অত্যন্ত উপেক্ষিত, অবহেলিত ও প্রত্যাক্ষাত বলে মনে করে। ফলে, এসব ব্যক্তির অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্যাবলী মাথাচারা দিয়ে ওঠে এবং তাদের অহং নিজেদের মধ্যে এক বিরাট দেয়াল বা জগৎ সৃষ্টি করে। যার ফলে তারা সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপার থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বৃদ্ধ ও চিররোগীদের আত্মহত্যা পরার্থবাদী আত্মহত্যার মধ্যে পরে কেননা, এ ধরনের আত্মহত্যাকারীগণ সমাজ ও সমাজের মানুষকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করে। সতীদাহ অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর আত্মবলিদান, শহীদদের আত্মবিসর্জন ও জাপানে প্রচলিত হারাকিরিও এ ধরনের আত্মহত্যার মধ্যে পড়ে। এ ধরনের আত্মহত্যাকে জনগণ শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এ প্রকারের আত্মবলিদানের ঘটনা বর্তমানের উক্ত উন্নত সমাজের চেয়ে প্রাচীন সমাজে বহুল প্রচলিত। এ প্রকারের আত্মহত্যা সমাজে মহৎ কারণে বা বৃহত্তর সামাজিক একতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

প্রথাবিহীন বা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিজনিত কারণে আত্মহত্যা আকস্মিক বিপত্তিমূলক সামাজিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটে থাকে। আত্মহত্যাকারী তার বিচার বিবেচনায় বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পায় না। যখন সমাজ ব্যবস্থা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিশীলিত করতে ব্যর্থ হয়, যখন সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে অর্থাৎ যে সামাজিক পরিস্থিতিকে দুরখেইম নিয়ম শৃঙ্খলা বিহীনতা বলে আখ্যায়িত করেছেন তখন সমাজে আত্মহত্যার ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে।

আত্মহত্যার প্রবণতা নিঃসঙ্গতা থেকে উৎপত্তি হয়। কোন ব্যক্তির মনে যখন এ ধরনের মনোভাব জন্মে যে, কেউ তাকে পছন্দ করে না বা দেখাশুনা করে না, সে অবস্থার কারণে আত্মহত্যা করার প্রবণতা জন্ম নিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতার ফলেও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। দুরখেইম-এর মতে সমাজ কাঠামোতে সাংঘাতিক ধরনের বিশৃঙ্খলার ফলেও আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বংশগত কারণও আত্মহত্যার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নয়। আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্যাবলী ও অনুকরণপ্রিয়তা আত্মহত্যা সমস্যার পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। দুরখেইম আত্মহত্যা সংক্রান্ত প্রচলিত

অনেক তত্ত্ব প্রত্যাখান করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তত্ত্ব অনুযায়ী আত্মহত্যা সমস্যা বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তিনি দলীয় সংহতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন (Durkheim: 1887)। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আত্মহত্যার সমস্যা বিশ্লেষণে দু'ধরনের তত্ত্ব বর্তমানে বহুল প্রচলিত মনসমীক্ষাগত তত্ত্ব ও দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব। মনঃ সমীক্ষণগত তত্ত্বের প্রবক্তা ফ্রয়েড আত্মহত্যার কারণ নির্ণয়ের জন্য দু'ধরনের প্রকল্পের প্রস্তাব করেন এবং তার একটি হলো বিষণ্ণতা তত্ত্ব ও অন্যটি হচ্ছে মৃত্যু প্রবণতা যা মানুষকে নিজের প্রাণসংহারে প্ররোচিত করে। যখন কোন লোক তার প্রিয়জনকে হারায় তখন যার কারণে হারিয়ে থাকে তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে থাকে এবং তাকে খুন করার প্রবৃত্তি তার মধ্যে প্রবল হতে থাকে, তখন সে আত্মহত্যা করে। *(রহমান : ১৯৯৮ : ১৫)*

বাংলাদেশসহ বিভিন্নদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা

আত্মহত্যা একটি নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পৃথিবীর সর্বত্র আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ও সফল আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আত্মহত্যা ও আত্মহননমূলক আচার-আচরণের ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্নদেশে আত্মহত্যার হার এবং প্রবণতার মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুয়ায়ী ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৮ সালে আত্মহত্যার হার প্রতি লক্ষে ৬.৩ থেকে ৭.৯ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী আত্মহত্যার সর্বোচ্চ হার হচ্ছে হাঙ্গেরিতে প্রতি লক্ষে ৩৩ জন এবং তার পরে উচ্চ হারের দিকে আছে চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, ও অস্ট্রিয়া। আত্মহত্যার সর্বনিম্ন হার হচ্ছে গ্রিস ও আয়ারল্যান্ডে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৭৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাপান, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে আত্মহত্যার হার বেশি। সেখানে প্রতি লক্ষে আত্মহত্যার হার ছিল ১৮ থেকে ১৫ জন এবং সবচেয়ে কমহার অর্থাৎ প্রতি লক্ষে ৫ থেকে ১০ জন হচ্ছে কানাডা, ইটালী, ভেনিজুয়েলা, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে ও নিউজিল্যান্ড। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ডে আত্মহত্যার হার কম অর্থাৎ প্রতি লক্ষে ৩.৫ জন। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এ প্রতিবছর প্রায় ৫৫০০ লোক আত্মহত্যা করে থাকে।

১৯৮৩ সালে জাপানে আত্মহত্যা করেছিল ২৫,২০২ জন। এই সংখ্যা ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৮.৭ ভাগ বেশি। জাপানে ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে ১৯৮৩ সালে। ঐ বছর জাপানে প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে গড়ে ২১.১ জন আত্মহত্যা করেছিল। ১৯৮২ সালে জাপানে প্রতি লক্ষ মানুষের মধ্যে ১৭.৯ জন আত্মহত্যা করেছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ থেকে ২৪ বছরের যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রতি লক্ষে ২০ জন, তদুর্ধ বয়সের লোকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ১৯৫০ সালের চেয়ে ১৯৮০ সালে প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ থেকে ২৪ বছরের যুবকদের মধ্যে ১৯৫৭ সালে আত্মহত্যার হার যেখানে ছিল প্রতি লক্ষে ৪ জন, ১৯৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি লক্ষে ১০.৯ জন, ১৯৭৫ সালে ১২.২ জন এবং ১৯৭৯ সালে ১২.১ জন। দশ বছর থেকে বিশ বছরের যুবক ও কিশোরদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা। যদিও মেয়েদের তুলনায় পুরুষ কিশোরদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা বেশি কিন্তু পুরুষের তুলনায় মহিলারা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায় বেশি। তুলনামূলকভাবে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ও মুসলিম দেশসমূহে আত্মহত্যার হার কম। যে বছরগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা থাকে সে সব বছরে আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর আত্মহত্যার একই হার বজায় থাকে, যে বছরগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরগুলোতে আত্মহত্যার হার কমে যায় *(রহমান : ১৯৯৮ : ১০-১১)।*

বাংলাদেশে আত্মহত্যার উপর পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। ১৯৪৭ সালে একটি বৃটিশ দৈনিক সংবাদপত্রে বাংলাদেশে আত্মহত্যার উপর একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় সেখানে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলাকে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা-প্রবণ এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক আত্মহত্যা করে এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায়, যাদের মধ্যে মহিলাদের হার সর্বোচ্চ। ১৯৯২ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৯৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭৫৭টি আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে ৪৬০ জন মহিলা এবং ২৯৭ জন পুরুষ *(রহমান : ২০০০)।*

জেলা অনুযায়ী আত্মহত্যার হার

জেলা	আত্মহত্যার হার (প্রতি হাজারে)
ঝিনাইদহ	৫.২৪
মাগুরা	৪.৬৭
চুয়াডাঙ্গা	৪.৬৬
নড়াইল	৪.০৯
সাতক্ষীরা	৩.৬৬
যশোর	৩.৩৭
কুষ্টিয়া	৩.২০
ময়মনসিংহ	০.০২
চট্টগ্রাম	০.০৩
কক্সবাজার	০.৩৫
সিলেট	০.৩৫
নোয়াখালী	০.৪১

উৎস ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারী ১৯৯৯

উপর্যুক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, ঝিনাইদহ জেলায় সর্বোচ্চ আত্মহত্যার হার বিরাজমান। ১৯৯৯ সালের ১৮ই আগস্ট একটি স্থানীয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত ২৮ বছরে ঝিনাইদহ জেলায় প্রায় ২০ হাজার পুরুষ ও মহিলা আত্মহত্যা করে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে গড়ে প্রতিবছর ৮০০ জন এবং প্রতি ১১ ঘণ্টায় কমপক্ষে ১ জন পুরুষ অথবা মহিলা এ জেলায় আত্মহত্যা করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঝিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যা একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০০০-২৫০০ লোক আত্মহত্যা করে এবং ঝিনাইদহ জেলায় ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৮০০০ লোক আত্মহত্যা করে।

১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যার সংখ্যা বিন্যাস

সাল	আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা
১৯৮৯	৭৩৪
১৯৯০	৭৩৯
১৯৯১	৮৪৫
১৯৯২	৮৭৬
১৯৯৩	৭৪৪
১৯৯৪	৬৪২
১৯৯৫	৭১৯
১৯৯৬	৮৩০
১৯৯৭	৬৮৬
১৯৯৮	৭৮৮
১৯৯৯ (৬ মাস)	৪০২

উৎস ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ আগস্ট ১৯৯৯

নিচের টেবিলে ১৯৯৮ সালে ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত আত্মহত্যার চিত্র প্রদর্শিত হল, যেখানে মোট আত্মহত্যাকারীর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই মহিলা।

১৯৯৮ সালের উপজেলা অনুযায়ী আত্মহত্যার বিন্যাস

উপজেলা	আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা
ঝিনাইদহ সদর	২৫০
শৈলকুপা	২০৩
কোট চাঁদপুর	৪৯
হরিণাকুন্ডু	৮১
কালীগঞ্জ	১১৯
মহেশপুর	৮৬
মোট	৭৮৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ জানুয়ারী ১৯৯৯

উপর্যুক্ত টেবিল হতে এটি লক্ষণীয় যে ১৯৯৯ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলায় ৪০২ জন আত্মহত্যা করেছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগই মহিলা। নিচের টেবিলে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত উপজেলা অনুযায়ী আত্মহত্যাকারীর শতকরা হার দেখানো হল।

উপজেলা অনুযায়ী আত্মহত্যাকারীর বিন্যাস (৩১ জুলাই ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত)

উপজেলা	আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা	%
ঝিনাইদহ সদর	১৪২	৩৫.৩
শৈলকুপা	৮৬	২১.৪
কোট চাঁদপুর	৪০	১০
হরিণাকুন্ড	৬১	১৫
কালীগঞ্জ	৩৩	৮.২
মহেশপুর	৮০	১০
মোট	৪০২	১০০

উৎস ঃ ডেইলি ষ্টার, ৩০ আগস্ট, ১৯৯৯

একটি জরীপে দেখা যায় মহিলা আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে শতকরা ৮২ ভাগ বিবাহিত এবং বাকী ১৮ ভাগ অবিবাহিত। ১৫ থেকে ২৯ বৎসর বয়সে সর্বোচ্চ আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয় এবং আত্মহত্যাকারীর শতকরা ৬৬ ভাগই অশিক্ষিত। আত্মহত্যার কারণ হিসেবে পারিবারিক কলহ (৬৪%), কঠিন ও পুরাতন রোগযন্ত্রণা (১%) এবং যৌতুক (৭%) কে চিহ্নত করা হয়।

যদিও এ জেলায় পূর্ব থেকে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে আসছিল তথাপি বর্তমানে ফসলের মাঠে প্রয়োগের কীটনাশক (বিষ) পানের মাধ্যমে আত্মহত্যার ঘটনা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বর্তমানে এ জেলায় শতকরা ৭৫ ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে মারাত্মক কীটনাশক বিষ ও নেশা জাতীয় পানীয় ব্যবহারের মাধ্যমে। বাকী শতকরা ২৫ ভাগ আত্মহত্যা গলায় দড়ি দিয়ে অথবা অন্যান্য পদ্ধতিতে। মে এবং নভেম্বর মাসের মাঝেই অধিকাংশ আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। কাকতালীয়ভাবে প্রায় সকল কৃষিভিত্তিক পরিবারেই ক্ষেতে প্রয়োগের জন্য এ সময় বাড়িতে নানা ধরনের কীটনাশক (বিষ) পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ থাকে।

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

বাংলাদেশ জনবহুল এবং দরিদ্রপীড়িত একটি দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্রতার হার তুলনামূলক ভাবে বেশি। দারিদ্র, হতাশা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, কলহ, দীর্ঘ রোগভোগ ইত্যাদি কারণে এ দেশের প্রায় সকল

জেলাতেই আত্মহত্যার প্রবণতা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ঝিনাইদহ এমন একটি জেলা যেখানে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেশি। এই অঞ্চলের আত্মহত্যার উপর বিভিন্ন দৈনিকে অসংখ্য প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। সচেতন শিক্ষিত মহল ও সমাজসেবীদের মধ্যে প্রায়শ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে দেখা গিয়েছে যা বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। তাছাড়া ঝিনাইদহ জেলার আত্মহত্যার প্রবণতার উপর গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হল ঃ

১. আত্মহত্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা;
২. আত্মহত্যার সাথে সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী চিহ্নিত করা;
৩. মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার উচ্চ প্রবণতার কারণসমূহ খুঁজে বের করা;
৪. আত্মহত্যাকারীগণের পারিবারিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং
৫. আত্মহত্যার প্রবণতা রোধকল্পে কার্যকরী সুপারিশমালা প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পাদনে কেস ষ্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গবেষণা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রশ্ন এবং আবদ্ধ প্রশ্নপত্রের আশ্রয় নেয়া হয়। গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যসমূহকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. প্রাথমিক তথ্য ঃ আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের নিকট আত্মীয়স্বজন এবং বিবাহিত মহিলা আত্মহত্যাকারীর ক্ষেত্রে তার নিকট আত্মীয়স্বজন। পরিবারের সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, পাড়া-প্রতিবেশীকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. মাধ্যমিক তথ্য ঃ মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসাবে আত্মহত্যার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অফিস থেকে এবং তথ্য সংগ্রহকারী ও গবেষকদের পর্যবেক্ষণ রেকর্ড, স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনের রেকর্ড, বিভিন্ন বই, দৈনিক পত্রিকা থেকে সহায়ক মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও তথ্য বিশ্লেষণ ঃ

তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হয় ঃ-

১. ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলায় আত্মহত্যার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা করা হয়।
২. গবেষণায় শৈলকুপা উপজেলাধীন ৯নং মনোহরপুর ইউনিয়নকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

৩. মনোহরপুর ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ বছর সময়ের মধ্যে যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের মধ্য হতে ৪০জন আত্মহত্যাকারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

৪. বিভিন্ন সময়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে যারা অসফল হয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মনস্তত্ত্ব ও আত্মহত্যা প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে তাদের অনুভূতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা হয়।

৫. সাম্প্রতিক সময়ের দৈনিকে প্রকাশিত আত্মহত্যা সংক্রান্ত সংবাদের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা ও সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রশ্নমালা দ্বারা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী পরিসংখ্যানের সরল পন্থায় টেবিল আকারে সাজিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণা এলাকা পরিচিতি

ঝিনাইদহ শহর থেকে ২২ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে এবং মহাসড়ক থেকে ৮ কিঃ মিঃ দূরে শৈলকুপা শহরটি খরস্রোতা কুমার নদের উত্তর তীরে ২৩°৪১ অক্ষাংশ এবং ২৩°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শৈলকুপা কৃষি প্রধান এবং বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে পরিচিতি। শৈলকুপা শহর হতে ২ কিঃ মিঃ দক্ষিণে কুমার নদের তীরে মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। এর উত্তরে শৈলকুপা পৌরসভা, পূর্বে ৮নং ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদ, দক্ষিণে ১০ বগুড়া ইউনিয়ন পরিষদ এবং পশ্চিমে ১৩নং উমেদপুর ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব নাম ছিল ৯নং ফাজেলপুর ইউনিয়ন পরিষদ। পরবর্তীতে ফাজেলপুর শৈলকুপা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১৯৯২ সালে ইউনিয়নটির নামকরণ করা হয় ৯নং মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়নের মোট আয়তন ১০.২৯ বর্গমাইল বা ২৬.৬২ বর্গ কিঃ মিঃ। গ্রামের সংখ্যা ১৩টি; মোট জনসংখ্যা ২১,১১২ জন, শিক্ষিতের হার ২৮.৯%। ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ২টি বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, ১টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৩৫টি মসজিদ, ৬টি মন্দির, ১টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ১৭টি সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪১৯৭.৮৮ একর। ১৩টি গ্রামের মধ্যে ৫টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন হয়েছে। জনসংখ্যার অধিকাংশই চাষাবাদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

মনোহরপুর ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামের মোট ৪০টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে মনোহরপুর গ্রামে ৪টি, আউশিয়া গ্রামে ৭টি, হিতামপুর গ্রামে ১টি, দামুকদিয়া গ্রামে ৬টি, লক্ষ্মীপুর গ্রামে ৩টি, মাধবপুর গ্রামে ৫টি, বিষ্ণুদিয়া গ্রামে ৩টি, মহিষডাঙ্গা গ্রামে

১টি, পাঠানপাড়া গ্রামে ১টি, বিজুলিয়া গ্রামে ১টি, পাইকপাড়া গ্রামে ৩টি নওয়াপাড়া গ্রামে ৪টি ও মোন্দাহ গ্রামে ১টি ঘটনা ঘটছে।

টেবিল-১
আত্মহত্যার গ্রামওয়ারী সংখ্যা

গ্রাম	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মনোহরপুর	৪	১০.০০
আউশিয়া	৭	১৭.৫
হিতামপুর	১	২.৫
দামুকদিয়া	৬	১৫.০
লক্ষীপুর	৩	৭.৫
মাধবপুর	৫	১২.৫
বিষ্ণুদিয়া	৩	৭.৫
মহিষডাঙ্গা	১	২.৫
পাঠানপাড়া	১	২.৫
বিজুলিয়া	১	২.৫
পাইকপাড়া	৩	৭.৫
নওয়াপাড়া	৪	১০.০
সোন্দাহ	১	২.৫
মোট	৪০	১০০.০০

টেবিল-২
আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা

আত্মহত্যাকারী	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মহিলা	৩২	৮০.০০
পুরুষ	৮	২০.০০
মোট	৪০	১০০.০০

উপরের টেবিল হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে ৪০ জন আত্মহত্যাকারীর মধ্যে ৩২ জন মহিলা এবং ৮ জন পুরুষ। অর্থাৎ পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা অধিক।

টেবিল-৩
আত্মহত্যাকারীদের বয়স

বয়স	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১০-১৪ বছর	৩	৭.৫	২	৫.০	৫	১২.৫
১৫-১৯ বছর	০	০	১৩	৩২.৫	১৩	৩২.৫
২০-২৪ বছর	২	৫.০	১০	২৫.০	১২	৩০.০
২৫-২৯ বছর	২	৫.০	৬	১৫.০	৮	২০.০
৩০-৩৪ বছর	১	২.৫	১	২.৫	২	৫.০
৩৫-৩৯ বছর	০	০	০	০	০	০
৪০ ঊর্ধ্বে	০	০	০	০	০	০
মোট	৮	২০	৩২	৮০	৪০	১০০

এই টেবিলের ক্ষেত্রে ৪০ জন আত্মহত্যাকারীর মধ্যে ৫ জনের (১২.৫%) বয়স ১০-১৪ বছর বয়সের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা, ১৩ জনের (৩২.৫) বয়স ১৫-১৯ বছর বয়সের মধ্যে এবং এদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, ১৩ জনই মহিলা, ১২ জনের (৩০%) বয়স ২০-২৪ বছর বয়সের মধ্যে এবং এদের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা, ৮ জনের (২০%) বয়স ২৫-২৯ বছরের মধ্যে এবং এদের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা। ৩০-৩৪ বছর বয়সের মধ্যে ২ জন (৫%) ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা, ৩৫-৩৯ বছর ও ৪০ ঊর্ধ্ব বয়সের কোন আত্মহত্যাকারী নেই।

টেবিল-৪
আত্মহত্যাকারীদের শিক্ষার স্তর

শিক্ষার স্তর	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিরক্ষর	২	৫.০	১৫	৩৭.৫	১৭	৪২.৫
১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩	৭.৫	১০	২৫.০	১৩	৩২.৫
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	১	২.৫	৭	১৭.৫	৮	২০.০
এস. এস. সি	০	০	০	০	০	০
এইচ. এস. সি	০	০	০	০	০	০
বি. এ	২	৫.০	০	০	২	৫.০
মোট	**৮**	**২০.০**	**৩২**	**৮০**	**৪০**	**১০০**

উপর্যুক্ত টেবিল থেকে বুঝা যাচ্ছে যে আত্মহত্যাকারীদের অধিকাংশ অথাৎ শতকরা ৪২.৫ ভাগই নিরক্ষর এবং এদের মধ্যে পুরুষ ৫ ভাগ (২ জন) এবং মহিলা ৩৭.৫ ভাগ (১৫ জন)।

টেবিল-৫
আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাস্তর

শিক্ষার স্তর	পিতা		মাতা		ভাই		বোন	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিরক্ষর	২৭	৬৭.৫	৩২	৮০.০	১২	৩০.০	২০	৫০.০
১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৮	২০.০	৭	১৭.৫	১৪	৩৫.০	১২	৩০.০
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩	৭.৫	১	২.৫	৮	২০.০	৬	১৫.০
এস. এস. সি	০	০	০	০	২	৫.০	১	২.৫
এইচ. এস. সি	২	৫.০	০	০	২	৫.০	১	২.৫
বি.এ	০	০	০	০	২	৫.০	০	০
মোট	**৪০**	**১০০**	**৪০**	**১০০**	**৪০**	**১০০**	**৪০**	**১০০**

আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের সদস্য বিশেষ করে পিতা-মাতা ভাই-বোনদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৬৭.৫ ভাগের (২৭ জন) পিতা, ৮০.০০ ভাগের (৩২ জন) মাতা, ৩০ ভাগের (১২ জন) ভাই এবং শতকরা ৫০ ভাগের (২০ জন) বোন নিরক্ষর। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী এবং ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পিতামাতার তুলনায় ভাই বোনদের শিক্ষার হার মোটামুটি কিন্তু এস. এস. সি ও তদূর্ধ্বে সকলেরই শিক্ষার হার অত্যন্ত নিম্ন।

টেবিল-৬
আত্মহত্যাকারীদের পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
গৃহিনী	১৮	৪৫.০
কৃষক	২	৫.০
ব্যবসায়ী	০	০
দিনমজুর	২	৫
ঝিগিরি	৭	১৭.৫
রিক্সা/ভ্যান চালক	২	৫.০
ছাত্র/ছাত্রী	৮	২০.০
ভিক্ষুক	১	২.৫
চাকুরি	০	০
মোট	৪০	১০০

পেশাগত দিক থেকে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ গৃহিনী, ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী, ১৭.৫ ভাগ ঝিগিরি, ৫ ভাগ কৃষক, দিনমজুর, ভ্যান চালক এবং ২.৫ ভাগ ভিক্ষুক রয়েছে। অর্থাৎ আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে গৃহিনীর সংখ্যাই বেশি প্রতীয়মান হচ্ছে।

টেবিল-৭
আত্মহত্যাকারীদের পরিবার প্রধানের পেশা

৭নং টেবিলে উপস্থাপিত উপাত্ত হতে দেখা যাচ্ছে যে, আত্মহত্যাকারীদের পরিবার

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষক	১৫	২৩.৫
দিনমজুর	১১	২৭.৫
গৃহিনী	১	২.৫
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	১	২.৫
চাকুরি	৪	১০.০
ড্রাইভার	১	২.৫
মাঝি	১	২.৫
রিক্সা/ভ্যান চালক	৩	৭.৫
জেলে	১	২.৫
ঝিগিরি	১	২.৫
ভিক্ষুক	১	২.৫
মোট	৪০	১০০

প্রধানের মধ্যে শতকরা ৩৫.৫ ভাগ (১৫ জন) কৃষক, ২৭.৫ ভাগ দিনমজুর, ১০ ভাগ চাকুরিজীবী। অর্থাৎ যে পরিবারের প্রধান কৃষক ও দিনমজুর তাদের পরিবার থেকে বেশি আত্মহত্যা করছে।

টেবিল-৮

আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের মাসিক আয়

মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১০০০ টাকা পর্যন্ত	৪	১০.০
১০০১-১৫০০ টাকা পর্যন্ত	১৩	৩২.৫
১৫০১-২০০০ টাকা পর্যন্ত	৫	১২.৫
২০০১-২৫০০ টাকা পর্যন্ত	৫	১২.৫
২৫০১-৩০০০ টাকা পর্যন্ত	৪	১০.০
৩০০১-৩৫০০ টাকা পর্যন্ত	৪	১০.০
৩৫০১-৪০০০ টাকা পর্যন্ত	২	৫.০
৪০০০ টাকার ঊর্ধ্বে	৩	৭.৫
মোট	**৪০**	**১০০**

আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিদের পরিবারের মাসিক আয় সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৪০টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩টি পরিবারের (শতকরা ৭.৫ ভাগ) মাসিক আয় ৪০০০ টাকার ঊর্ধ্বে এবং ১৩টি পরিবার (৩২.৫ ভাগ) এর মাসিক আয় ১০০১-১৫০০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ নিম্ন আয়ের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা অধিক।

টেবিল-৯

আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের ভূমির পরিমাণ

ভূমির পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভূমিহীন	৬	১৫.৫
১-৫ কাঠা	১৩	৩২.৫
৬-১০ কাঠা	৪	১০.০
১১ কাঠা-৩ বিঘা	১০	২৫.০
৪-১০ বিঘা	৪	১০.০
১১-২০ বিঘা	১	২.৫
২০ বিঘার ঊর্ধ্বে	২	৫.০
মোট	**৪০**	**১০০**

আত্মহত্যাকারী পরিবারের ভূমির পরিমাণ (টেবিল-৯) পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের ৬টি অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ ভূমিহীন, যাদের কোন জমি-জমা নেই। ১৩টি অর্থাৎ ৩২.৫ ভাগ পরিবারের ১-৫ কাঠা জমি আছে অর্থাৎ এদের শুধুমাত্র

বসতবাড়ি ব্যতীত কোন জমি/সম্পত্তি নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র বসতবাড়ি ব্যতীত আর কোন জমি/সম্পত্তি নেই এমন পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

টেবিল-১০
আত্মহত্যার কারণসমূহ

কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব	৬	১৫.০
স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচার	৭	১৭.০
সতীনের অত্যাচার	১	২.৫
যৌতুকের জন্য নির্যাত	৪	১০.০
প্রেমে ব্যর্থতা	৪	১০.০
স্ত্রীর (আত্মহত্যাকারীর) ছোট বোনের সাথে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক	১	২.৫
স্বামীর পরনারীতে আসক্তি	১	২.৫
অবৈধ যৌন সম্পর্ক ধরা পড়া	১	২.৫
পরীক্ষায় ফেল করা	১	২.৫
চরম দারিদ্র ও খাদ্যাভাব	১	২.৫
স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া	১	২.৫
বাবা-মা, ভাই-বোনদের প্রতি অভিমান	৫	১২.৫
যৌন-অক্ষমতা	১	২.৫
রোগ যন্ত্রণা	১	২.৫
বিবাহ পূর্ব প্রেম (ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে)	১	৫.০
স্ত্রীকে ঠিকমত ভরনপোষণ না দেয়া বা তালাক দেয়া	২	২.৫
স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম	১	২.৫
যৌন নির্যাতন	১	২.৫
মোট	৪০	১০০

টেবিল-১০ এ উপস্থাপিত উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আত্মহত্যার অসংখ্য কারণ রয়েছে তবে মনোহরপুর ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামে সংঘটিত ৪০টি আত্মহত্যার ঘটনার নেপথ্যে শতকরা ১৫.০ ভাগ (৬টি) স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, শতকরা ১৭.০ ভাগ (৭টি) স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচার, শতকরা ১০.০ ভাগ (৪টি) যৌতুকের জন্য নির্যাতন, শতকরা ১০.০ ভাগ (৪টি) প্রেমে ব্যর্থতা, শতকরা ১২.৫ ভাগ (৫টি) বাবা-মা, ভাই-বোনদের প্রতি অভিমানের মত কারণসমূহ দায়ী।

বসতবাড়ি ব্যতীত কোন জমি/সম্পত্তি নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র বসতবাড়ি ব্যতীত আর কোন জমি/সম্পত্তি নেই এমন পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

টেবিল-১০
আত্মহত্যার কারণসমূহ

কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব	৬	১৫.০
স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচার	৭	১৭.০
সতীনের অত্যাচার	১	২.৫
যৌতুকের জন্য নির্যাত	৪	১০.০
প্রেমে ব্যর্থতা	৪	১০.০
স্ত্রীর (আত্মহত্যাকারীর) ছোট বোনের সাথে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক	১	২.৫
স্বামীর পরনারীতে আসক্তি	১	২.৫
অবৈধ যৌন সম্পর্ক ধরা পড়া	১	২.৫
পরীক্ষায় ফেল করা	১	২.৫
চরম দারিদ্র ও খাদ্যাভাব	১	২.৫
স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া	১	২.৫
বাবা-মা, ভাই-বোনদের প্রতি অভিমান	৫	১২.৫
যৌন-অক্ষমতা	১	২.৫
রোগ যন্ত্রণা	১	২.৫
বিবাহ পূর্ব প্রেম (ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে)	১	৫.০
স্ত্রীকে ঠিকমত ভরনপোষণ না দেয়া বা তালাক দেয়া	২	২.৫
স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম	১	২.৫
যৌন নির্যাতন	১	২.৫
মোট	৪০	১০০

টেবিল-১০ এ উপস্থাপিত উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আত্মহত্যার অসংখ্য কারণ রয়েছে তবে মনোহরপুর ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামে সংঘটিত ৪০টি আত্মহত্যার ঘটনার নেপথ্যে শতকরা ১৫.০ ভাগ (৬টি) স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, শতকরা ১৭.০ ভাগ (৭টি) স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচার, শতকরা ১০.০ ভাগ (৪টি) যৌতুকের জন্য নির্যাতন, শতকরা ১০.০ ভাগ (৪টি) প্রেমে ব্যর্থতা, শতকরা ১২.৫ ভাগ (৫টি) বাবা-মা, ভাই-বোনদের প্রতি অভিমানের মত কারণসমূহ দায়ী।

টেবিল-১১

আত্মহত্যা করার পদ্ধতি

পদ্ধতি	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কীটনাশক (বিষ) সেবন	৩০	৭৫.০
দড়ি, শাড়ী, ধুতি প্রভৃতি দ্বারা ফাঁস লাগানো	৭	১৭.৫
অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি সেবন	১	২.৫
ইদুঁর মারা ঔষধ সেবন	২	৫.০
মোট	৪০	১০০

১১নং টেবিল হতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৩০ জন অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ কীটনাশক (বিষ) সেবন করে মারা যায়। ৭ জন অর্থাৎ শতকরা ১৭.৫ ভাগ ফাঁস দ্বারা মারা যায়। ১ জন অর্থাৎ শতকরা ২.৫ ভাগ অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি সেবনে মারা যায় এবং ২ জন শতকরা ৫ ভাগ ইঁদুর মারা ঔষধ সেবন করে মারা যায়। অর্থাৎ আত্মহত্যার পদ্ধতি হিসেবে বেশির ভাগ আত্মহত্যাকারী কীটনাশক সেবন ও ফাঁস লাগানোকে পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছে।

উপর্যুক্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

* আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে মহিলা আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা (৮০%) পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি।

* বয়সের দিক থেকে আত্মহত্যাকারীদের অধিকাংশই তরুণ (১৫-২৯)।

* শিক্ষার স্তর বিবেচনায় আত্মহত্যাকারীদের সিংহভাগই নিরক্ষর (৪২.৫%)। অর্থাৎ শতকরা ৩২.৫ ভাগ আত্মহত্যাকারী ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেছে। অপরপক্ষে আত্মহত্যাকারীদের পরিবারবর্গের শিক্ষার স্তরও অত্যন্ত নিম্ন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ নিরক্ষর এবং ৩০ ভাগ ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে।

* আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী। পেশাগত দিক থেকে আত্মহত্যাকারী মহিলাদের শতকরা ৪৫ ভাগ গৃহিনী, শতকরা ১৭.৫ ভাগ ঝিগিরি করে এবং শতকরা ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী।

* অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আত্মহত্যাকারীদের একটি নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে চরম দারিদ্রের কারণে মহিলারা রোগে শোকে দৈহিক ও মানসিক দৈন্যদশায় থাকে, অন্যদিকে স্বামী ও স্বামীর মা- বোনের মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার ও যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে অসহায়ত্ব লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে থাকে।

* আত্মহত্যার নেপথ্যে অসংখ্য কারণ দায়ী। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ১৩টি গ্রামের ৪০টি আত্মহত্যার ঘটনা সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করতে আত্মহত্যার ১৯টি কারণ জানা গিয়েছে। তবে এ অসংখ্য কারণসমূহের মধ্যে কতিপয় কারণ যেমন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের অত্যাচার বিশেষ করে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, প্রেমে ব্যর্থতা, বিভিন্ন কারণে বাবা-মা, ভাই-বোনদের প্রতি অভিমান, দীর্ঘ রোগভোগ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, স্ত্রীকে নিয়মিত ভরন-পোষণ দিতে না পারা ও তালাক দেয়া ইত্যাদি আত্মহত্যার জন্য দায়ী।

* আত্মহত্যাকারীরা আত্মহত্যার জন্য যে পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি (৭৫%) বেছে নিয়েছে সেটি হল কীটনাশক সেবন। তবে আত্মহত্যার এ পদ্ধতিটি অবলম্বনের প্রধান কারণ হল কীটনাশকের সহজলভ্যতা। আত্মহত্যাকারীদের পরিবারের অধিকাংশেরই পেশা যেহেতু কৃষিকাজ, সেহেতু ফসলের মাঠে ছিটানোর জন্য সকল পরিবারেই কীটনাশক মজুদ থাকে। এ ছাড়া দড়ি, শাড়ী, ধুতি প্রভৃতি দ্বারা ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যাও কম নয়। কীটনাশক পানে আত্মহত্যার পরই শাড়ী, ধুতি, দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার স্থান (১৭.৫%)।

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শুধু মাত্র ঝিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি এবং দেশের অন্যান্য জেলায় কম তা এখন আর পূর্বের ন্যায় জোর দিয়ে বলা যায় না। একসময় এ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি ছিল এটি সমাজ গবেষকদের প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বলা যেত। তবে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে আত্মহত্যার যে সংবাদ ছাপানো হয় সেখানে শুধু ঝিনাইদহ জেলায় নয় বরং অন্যান্য জেলাসমূহও পিছিয়ে নেই। ১৯৯২-৯৩ সালে দৈনিক সংবাদপত্রের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দিনাজপুরে ৩৩ জন, সিরাজগঞ্জে ৩৪ জন, ঝিনাইদহে ২৮ জন, মাগুরায় ২৩ জন, যশোরে ২২ জন, মাদারীপুরে ২৪ জন, খুলনায়

৬৪ জন এবং ঢাকায় ৭৬ জন আত্মহত্যা করেছে (Kafi, Sharif : 1993, P. 47, 48)। চরম দারিদ্রত্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, আইনের শাসনের অভাব, জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও হতাশা ইত্যাদি উপাদান সমভাবে সমাজে আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে দায়ী। আত্মহত্যার এ ক্রমবর্ধমান হারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারকে অনতিবিলম্বে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরী। এক্ষেত্রে শুধু ঝিনাইদহেই নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হল ঃ

১। বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক এবং আত্মহত্যার উপর আরো বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করা।

২। সরকারি তত্ত্বাবধানে আত্মহত্যা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ পদ্ধতি উন্নয়ন ও প্রচলন করা প্রয়োজন।

৩। তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বিশেষ করে নারী উন্নয়নের জন্য আরো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

৪। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও অধিক হারে নারীর ক্ষমতায়ন আত্মহত্যার প্রবণতাকে হ্রাস করতে পারে।

৫। কিশোর-কিশোরীসহ যে সমস্ত বয়সের লোকজন সর্বাধিক আত্মহত্যা-প্রবণ বলে চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে একটি কার্যকর পরামর্শ প্রদান কর্মসূচির আওতায় আনা প্রয়োজন যাতে করে তারা মানসিক বিপর্যয় ও সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারে।

৬। কীটনাশক বাজারজাত ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকর উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

৭। স্থানীয় শালিস কার্যের জন্য অধিকতর মানবিক বিবেচনাপ্রসূত একটি উপবিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

৮। মহিলাদের আত্মহত্যার ঘটনা উচ্চ পদসহ পুলিশ অফিসার দ্বারা আত্মহত্যাকারিনীর পিতা-মাতা ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে তদন্ত করা দরকার। বিশেষ মহিলা পুলিশ স্কোয়াড দ্বারা মহিলা আত্মহত্যাকারীর আত্মহত্যার কারণ উদ্ঘাটনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

৯। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করে আত্মহত্যা-প্রবণ ব্যক্তিদের সহায়তা, পরামর্শ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০। বহু-বিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। গৃহবধূদেরকে তাদের স্বামী-শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের দ্বারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১। যৌতুক প্রথার অবসানকল্পে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং যৌতুক বিরোধী আইনের কার্যকর প্রয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে।

১২। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের সঠিক সামাজিকীকরণ, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত, ধর্মীয় চেতনার উন্নয়ন, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. *Harlock, Elizabeth B (1966), The Development of Psychology, Mac Graw-Hill Publishing Co. New York.*

২. *রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯৮), আত্মহত্যার আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯-১১।*

৩. *Durkheim, Emile, "Suicide" 1887.*

৪. *রহমান আনিসুর (২০০০), প্রথম আলো-১লা নভেম্বর ২০০০, 'ঝিনাইদহ অঞ্চলে এত কেন আত্মহত্যা' ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক পাতা, নারী মনস্তত্ত্ব পাতা থেকে।*

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, অবজারভার, ডেইলি ষ্টার (১৯৯৯ সালের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাস)।*

৬. *শৈলকুপা পরিসংখ্যান অফিস ও মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শৈলকুপা।*

৭. *Kafi A, Sharif, Suicides, Reports of a study in Jhenidah, Published by Bangladesh Development Partnership Centre (BDPC-1993, P. 47-48).*

ISSN-1605-2021

Lok Proshason Samoeeky
Vol. 23
June-2002/Joishtho-1409

Loss Reducing Mechanisms of the Riverbank Erosion Displacees in Bangladesh : A Case of Environmental Disaster

M. Zulfiquar Ali Islam*

Abstract : Riverbank erosion displaces millions of riparian inhabitants from their original homestead plots every year. It often dislocates agricultural land and destroys standing crops, roads and communications. As a matter of fact, it goads the rate of landlessness, and un- and under-employment. Nevertheless, the displacees have unflinching courage and resilience to confront with such adverse situations. In this critical and uncertain condition, they formulate and adopt multiple indigenous measures and techniques for reducing their enormous loss caused by the riverbank erosion displacement. The present paper is wedded to explore the mechanisms that the displacees of two Bangladeshi villages designed for demoting their socio-economic loss and consequent immense sufferings. They do it in their own ways as no institutional sources response to them. Finally, the paper frames some recommendations, which the policy planners and development organizations may consider in their future program content of planning for rural development in reverine Bangladesh.

Introduction

Riverbank erosion is a recurrent environmental disaster in Bangladesh. It contributes directly to the process of rapid pauperization for the riparian people. It displaces millions of people from their riparian tract every year (cf. Elahi and Rogge 1990) and claims many lives and properties as well. The disaster often dislocates cultivable land and human settlements, and also it destroys standing crops, roads and communications. While the majority of rural people do not have access to food, housing, and medical facilities, the disaster of riverbank erosion further intensifies this alarming condition annually.

An estimate indicates that 85 percent people of Bangladesh live below the poverty line in 1970s (see FAO 1989; GPRB 1980). An extreme poverty level accounts 54 percent of the total population (BBS 1981). These proportions are decreased to 40 and to 25 percent respectively during the 1980s and in the early 1990s (GPRB 1992). Since land is the principal resource to the riparian people, this disaster aggravates the rate of landlessness, homelessness, and un and under-employment. As a matter of fact, the overall social and economic development of the country receives deterioration in such alarming condition.

* Assistant Professor, Department of Sociology, University of Rajshahi.

It is surprising but fact that the riverbank erosion displacees of Bangladesh have to adapt to the hazardous reverine environment. As a matter of fact, they have to formulate and undertake multiple measures and techniques for reducing their enormous socioeconomic loss induced by the riverbank erosion displacement. In devoid of administrative and institutional support, the displacee's position in the social hierarchy and low level technological know-how force them to do what is corrective in nature for minimizing their loss.

This paper is wedded to explore the mechanisms that the displacees design and undertake to curtail their loss and consequent immense sufferings as they could as possible. Finally, the paper wrapped up its job with some recommendations, which the policy planners and implementers may consider for their future planning of rural development.

Study Locale and Data Sources

Sehala and Kaloni-two medium-sized villages of Nawabganj District in the northwestern region of Bangladesh are selected as study locale. These villages are covered by same mauza[2]. They are located in the physiograhic and ecological setting. They have identical culture area and regional economy as they are adjoining each other. The geographical features of this thana[3] indicate that more or less half of the thana area amounting to 91,039 acres is charland[4]. The unstable characteristics of the Ganges (see Hossain 1991; Kalam and Jabbar 1991) and the Mahananda indicate that the north bank of the Ganges (Bangladesh) and the both banks of the Mahananda are more susceptible to erosion. It is one of the worst erosion affected thanas in the country (see Curry 1979; Nazem & Elahi 1990).

The principal rationale for selecting Sehala and Kaloni as study locale is that a sizeable number of displacees from different erosion-affected areas of Nawabganj District have settled in these peri-urban village in order to search for food, shelter, and employment. These two villages adjoin Nawabganj Town and the Barind Tract[5] as well. Both the villages provide the displacees with the access to the labor market of Nawabganj Town and also to the agricultural employment of the Barind tract. The catastrophic effects of riverbank erosion in Nawabganj and the sheer lack of social studies on this problem in the Ganges-Mahananda floodplain establish another point of rationale for selecting these study locales. It is quite disappointing that despite such devastating conditions of

Nawabganj and adjacent areas, no socio-economic research has, to date, been carried out on the problem. The choice of Sehala and Kaloni is thus justifiable from the methodological point of view.

The sample size of Sehala is 36 displacee households (20.34% of the total) and its displacee population is 233 (23.49% of the total). Another village Kaloni contains 104 displacee households (55.03 & of the total with a population of 533 (57.68% of the total). The displacee households from different erosion-affected villages of Nawabganj Sadar Thana moved to Sehala and Kaloni and finally settled there. The present study considers all the displacee households of both the villages as the appropriate primary sampling units. The displacee household heads were directly interviewed and in this way respective household head represents each sampling unit.

The principal tools for collecting the primary data are questionnaire and interviewing—two techniques of survey method. The major sources of primary data, in addition, include observation, informal interview, case histories, and case studies of selected persons and notable issues. Additional sources of data used in this study are collections and analyses of local level office reports, evaluation of government and semi-government projects, programs and census reports, published reports and articles, etc.

Loss Acceptance

The displacees of Sehala and Kaloni were forced to accept their loss due to riverbank erosion. They did not have any alternative choice of loss acceptance as they failed in protecting their cultivable land, homestead plot, and other valuable properties from the cataclysm of riverbank erosion. Their local initiative and indigenous technology of bamboo crates for preventing erosion-attack ended in failure. Their preventive strategies were found to be worthless and the erosion-attack went out of their control. Eventually, the displacees of Sehala and Kaloni accepted their loss due to riverbank erosion through formulating some corrective measures.

More than 69 percent displacees of Sehala and all the displacees from Kaloni undertook the corrective strategy of land desertion and they accepted their massive loss caused by riverbank erosion. Haque (1919) found in Kazipur that 63 percent of his respondents actually abandoned their original homestead. The highest level of their vulnerability to

riverbank erosion compelled them to desert their original homestead plot on the riparian tract. They left their original place without intending ever to return as they lost their homestead plot fully or partially. The desertion of land is an unequivocal acceptance of the loss caused by riverbank erosion (Haque 1991).

The displacees adopted another measure of loss acceptance. They started to pray to Allah as they found the prevention of erosion beyond their control. It is nothing but a negative acceptance of their loss in the name of praying to Allah. More than 72 percent displacees of Sehala and nearly one-fourth of Kaloni prayed to Allah for the prevention of riverbank erosion. This strategy has been made on the basis of their religious faith.

The displacement status predicates that the preponderant majority of twice (83.33%) and thrice (75%) displacees of Sehala deserted their original homestead plot and in this way they accepted their loss due to erosion. At the same time, the highest proportion of once displacees prayed to Allah for the prevention of erosion. In Kaloni, all the displacees of each group deserted their land and a considerable proportion of them prayed to Allah as well. The correlation between loss acceptance and displacement status is significant at 0.6768 level for Sehala and for Kaloni at 0.9783.

While the only one average peasant of Kaloni prayed to Allah and deserted original homestead as well. Two-third each of the poor peasants from Sehala adopted both the strategies and all of their counterparts of Kaloni only deserted their original homestead plot. All the marginal peasant and landless displacees of Sehala prayed to Allah and deserted their homestead plot respectively. The highest proportion of landless of Sehala and all of their counterparts from Kaloni deserted their land in accepting the loss due to riverbank erosion. The relationship is partially negative at -0.4982 level for Sehala and at -0.3985 for Kaloni.

In Sehala, all the displacees of upper income group adopted the strategy of land desertion and the highest percentages of lower (62.50%) and marginal (80%) income groups prayed to Allah. Simultaneously, all the displacees of all income groups from Kaloni deserted their original homestead plot and searched shelter in a safer place. The correlation is significant at -0.7784 level for Sehala and at -0.5825 for Kaloni.

The educational status indicates that all the displacees of all education levels from Sehala prayed to Allah and also deserted their original homestead. The highest percentage of illiterate displacees deserted their land for accepting loss due to erosion. On the other hand, all the displacees of all education levels deserted land in doing this. The relationship is significant at -0.5162 level for Sehala and at -0.4006 for Kaloni.

The preponderant majority of nuclear and joint families from Sehala prayed to Allah and that of nuclear one also deserted their homestead plot. In Kaloni, all the displacees of both the family types deserted their land and a considerable proportion of them also prayed to Allah. While the family type in Sehala shows perfectly (-1) correlation with loss acceptance, it is perfectly positive (+1) for Kaloni.

Almost all the displacees of both villages deserted plot and it is their indigenous strategies for accepting their loss due to erosion. Also a considerable proportion of them prayed to Allah for preventing the erosion and it is nothing but a negative acceptance of their loss due to erosion. The strategy of praying Allah is not the outcome of their fatalistic attitude but of their religious faith. They made this strategy as believers in order to console themselves in accepting their prodigious loss due to erosion. The variable of educational status indicates that this strategy was not enveloped by their ignorance. As a matter of fact, it is found that most of the illiterate displacees do not have any practice of praying Allah in their everyday routine of works.

Mechanisms for Loss Reduction

The displacees of Sehala and Kaloni formulated and undertook some strategies to reduce the quantity of their economic loss due to riverbank erosion. Nearly 2 percent displacees of Kaloni found their indigenous technology of bamboo crates and sandbag partially effective in protecting their land. The strategy of land protection minimizes the displacee's loss but it is not a long-run strategy. It may be partially effective in a season and may be eventually subjected to erosion in the next season as well.

A considerable proportion of the displacees sold their properties after displacement for reducing their loss. They adopted this strategy to procure some economic supports in adapting to the changing environment.

Sale of the Title of Eroded Land

It is found that one (2.78%) displacee of Sehala and nearly 38 percent of them were forced to sell the title of their land engulfed by riverbank erosion. They sold it to the wealthy landowners who can afford to wait for the reemergence of that land (Rogge 1991; see also Zaman 1987; Haque & Hossain 1987). Eventually, they rendered members of the large army of landless people in Bangladesh.

Sale of Livestock

It has been found that one (2.78%) displacee of Sehala and 29.81 percent of Kaloni sold their livestock in reducing loss. It was one of their means of livelihood in the pre-displacement period. It is empirically supported by the findings of Haque (1991) and of Rogge (1991). Haque (1991) predicated that 23 percent of the displacees in Kazipur reduced their loss through selling livestock. Rogge (1991) found that some 24 percent of the displacees in Kazipur, 37 per cent in Chilmari, and 29 percent in Bhola sold their livestock at the time of displacement. It is, in rural Bangladesh, easier to sell livestock than other assets and to have cash with any degree of immediacy (Rogge & Haque 1987).

Cutting Standing Crops

Nearly 14 percent displacees of Sehala and about 8 percent from Kaloni cut and/or grazed their standing crops from their cropping field subjected to erosion. Many of these displacees also sold their remaining cultivable land. They procured money through selling these in order to purchase land and housing materials.

Moving Properties

The loss-reduction strategies of moving tangible properties accounted for 5.56 percent displacees from Sehala and for over 89 percent of Kaloni. They also sold many tangible valuable assets. These properties includes ornaments of female members, bicycle, bullock cart, plow, wooden furniture, corrugated iron sheet, utensils, etc.

Salvaging Housing Structure

The loss-reduction strategy of salvaging housing structure was widely practiced by the displacees of Sehala and Kaloni. They were nearly 90 percent from Sehala and more than 99 percent of Kaloni while it was 52.2 percent in Kazipur (Haque 1991), and 47 percent in Kazipur, 36 percent in Chilmari, and 2.5 percent is Bhola (Rogge 1991). This strategy promptly helps them to build a hurt on the BWDB[6] embankment or on

*khas*land[7] or on the land owned by kin or neighbor after their displacement.

The structural pattern of residence of the displacees of Sehala and Kaloni on the original homestead was salvageable. All the households salvaged their mixed and/or cutcha houses except for houses built of rod cement concrete. Only one household of cutcha type failed to salvage its housing structure because it was engulfed by erosion at once.

Case # 1

> Md. Idris Hossain Gharami is a man of 32 years old. He has experienced the displacement status thrice in his lifetime. He lost all his land and now is landless laborer. During his last displacement, he and his family members were sheltered under his relatives' shed in Kaloni. His homestead was at a distance of 3 meters and the erosion-attack engulfed it in a night. As a matter of fact, he did not have any chance to dismantle his hut.

Cutting and Selling Trees

The cutting trees is one of the loss-reduction strategies for environmental adaptation. It was undertaken by more than 11 percent of the displacees of Sehala and nearly 9 percent from Kaloni. They cut their standing trees and saved it from the attack of riverbank erosion. They reduced their loss through adopting this strategy to a smaller extent.

All the social variables of displacement status, landholding, annual income, educational status and family type make known the fact that the highest proportions of the displacees of each group of each variable widely practiced the loss-reduction strategy of salvaging housing structure. This strategy promptly helped them to build a hut on the BWDB embankment or on khasland or on the land owned by kin or neighbor after their displacement. The correlation with displacement status is significant at -0.3557 level for Sehala and at -0.2977 for Sehala and at 0.9894 and at 0.7327 respectively, with annual income of -0.2977 for Sehala and at 0.3197 for Kaloni, with educational status at 0.9659 and at o.6868 respectively, and with family type at -0.3849 level for Sehala and at -.01291 for Kaloni.

Shift of Lives and Properties

The shift of lives and properties from erosion-threatened homestead to a safer place is another corrective strategy undertaken by the displacees of Sehala and Kaloni. It encompasses some measures: the shift of family, of livestock, and of tangible goods from erosion affected area to erosion free

area. These are dominant measures adopted by the sample population. It has been found that all the displacees of both villages shifted their family from the riparian tract affected by riverbank erosion to the BWDB embankment, relative's shed, neighbors' land, khasland, etc. and to other villages as well. The measure of shifting livestock accounted for 19.44 percent displacees of Sehala and 18.27 percent from Kaloni. Another proportion of them (27.78% from Sehala and three-quarters of Kaloni) moved their tangible assets from erosion-attacked riparian tract to the places of their temporary shelter.

The statistical analyses reveal that the displacement status and family type partially positively correlated with their measures for shifting of lives and properties. The other variables of land ownership, annual income and educational status show partially negative correlation.

The proportion of the displacees of Sehala and Kaloni adopted the strategy of location change are more than two times multiple of that of the displacees of Kazipur (Haque 1991). Haque (1991) found that 43.5 percent of the displacees moved family, 9.3 percent livestock and 15.5 percent shifted their belongings from erosion-affected areas to comparatively safer places. It can be inferred from the field data that the displacees of Sehala and Kaloni adoped multiple strategies in accepting loss, in reducing loss, and in shifting their lives and properties due to riverbank erosion. It has been predicated that the dominant strategies are land desertion (100%) for loss-acceptance, salvaging housing structure (88.89% for Sehala and 99.04% for Kaloni) for loss-reduction, and shifting family (100%) for location change. The strategies of loss-acceptance, loss-reduction, and shifting of lives and properties contribute crucially to the process of displacees environmental adaptation to their precarious habitat caused by erosion.

Use of Movable Housing Materials

The use of movable housing materials is widely practiced by the displacees on their riparian tract. It is an incidental rather than purposive type of adaptation strategies (Haque 1991). It has been known that it is not a sheer incidental strategy in situation and in case of each respondent. More than one-quarter of the displacee households of Sehala and Kaloni reported that they had economic solvency for building pukka house on their original homestead plot but they did not do the same. Accrding to them, "nadikatar bhoye paka ghar karini, kokhon sarbonash hoy ke jane" (the threat of riverbank erosion prevented them from building pukka

house). They were compelled by the threat of riverbank erosion to use movable housing materials. In addition to this fact, many of the displacees built movable housing structure because they did not have any money for building concrete structure of dwelling unit.

The strategy of using movable housing materials is incidental to a large extent and also purposeful to a considerable extent. Their original housing structure prior to displacement was usually traditional. This housing structure were constructed of mud-dough, thatch, bamboo, tarja, wooden plank, tile, corrugated iron sheet, etc. These materials are easily movable and less susceptible to the damage caused by riverbank erosion. Not only that, the displacees of Sehala and Kaloni procured the resalable value of these housing materials immediately after displacement. They used this money in rebuilding their hut on the BWDB embankment or on khasland or on any other land owned by anybody, or beside the highways.

The displacees of both villages used corrugated iron sheet, tile, thatch, and rod cement concrete as roof materials prior to their displacement. It has been found that more than 44 percent displacees from Sehala and nearly 53 percent of Kaloni used corrugated iron sheet as roof material. It accounts for the highest proportion of the displacees. This roof material has resalable value through which the displacees reduced their loss. They were economically supported by this value in adapting to the changing riverine environment. The use of corrugated iron sheet is followed by that of thatch in covering roof of residential houses of the displacees. More than 36 percent displacees of Sehala and more than 22 percent of Kaloni had traditional housing structure covered by the roof material of thatch. It has no resalable but reusable value in rebuilding housing structure.

A considerable proportion of them also used burnt mud tile in covering their roof. The roof material of thatch is cheaper than tile, tile than corrugated iron sheet and corrugated iron sheet than rod cement concrete. More than 97 percent displacees of Sehala and 94 percent of Kaloni used the salvageable roof materials of thatch, tile, and corrugated iron sheet. At the same time, only 5.77 percent of Kaloni had rod cement concrete roof materials on their housing structure. The corrugated iron sheet has salvageable and reusable value; thatch and tile are only movable and reusable while rod cement concrete is neither salvageable nor resalable in the immediacy of riverbank erosion.

The wall materials used by the displacees of Sehala Colony prior to their displacement include brick, bamboo, thatch, and mud-dough, more than 22 percent displacees of Sehala and 47.12 percent of Kaloni used brick as wall material. Most of them jointed brick together by mud and they dismantled it in the cataclysm of riverbank erosion.

The following wall materials used are bamboo and/or thatch. It accounts for a considerable proportion (44.44% of Sehala and 17.31% of Kaloni) of the displacees while more than 33 percent of them from Sehala and 35.58 percent of Kaloni built wall of their residential houses with mud-dough. Except for mud-dough, all wall materials have salvageable and reusable value. Moreover, only the wall-material of brick has salvageable, reusable and resalable value.

The displacement status marks out the fact that the highest proportions of once, twice, thrice, and more than thrice displacees used corrugated iron sheet as roof materials and bamboo and thatch as wall materials.

Means of Transportation

The displacees used means of transportation in reducing their loss due to erosion. Nearly 17 percent displacees of sehala and more then 68 percent from Kaloni were incidentally helped by their means of transportation in adapting to the changing environment. Nevertheless, more than 83 percent from Sehala and nearly 32 percent of Kaloni did not possess any means of transportation. They possess indigenous means of transportation. These are bullock cart, dingi (country boat), and bicycle. They used these in carrying dismantled housing materials, wood, livestock, and other tangible goods during the onslaught of riverbank erosion and high flood. This task of shipping goods is not manually manageable and they used their means of transportation they possessed in doing this. The displacees with no means were helped and supported by their counterparts in carrying their goods from the erosion-affected homestead to safer places.

A perusal of data reveals that the highest proportion (nearly 14% from Sehala and 33.65% of Kaloni) of displacees owned bullock cart. They usually used this means in carrying harvested crops from the field to house. In the immediateness of riverbank erosion, the used it for carrying their salvaged housing materials and other weighty tangible goods. The means of bicycle and country boat, locally known as dingi or nouka, accounted for 5.56 percent displacees of Sehala and 17.31 percent of

Kaloni. The country boat is a very suitable transport during abnormal flood. More than 17 percent displacees of Kaloni possessed it in their pre-displacement period.

The displacement status shows that the highest proportion (15.38% of Sehala and 30.77% of Kaloni) of once displacees did not have any means of transportation. More of the once displacees of both the villages had poor economic standing and proportionately smaller homestead plot than their counterparts on their original place. While their counterparts larger homestead plots were dislocated by more than one attack of erosion, their smaller plots were engulfed by one erosion attack. The highest proportions of twice, and of thrice displacees of Kaloni possessed bullock cart and used it in reduction the hazard loss. Moreover, the highest proportion of more then thrice displacees of the same village had country boat for carrying salvaged housing materials and other necessary goods from the erosion-affected homestead to the places of shelter.

Investment Pattern

The displacees during the pre-displacement period invested their capital in purchasing land in Sehala and Kaloni, and other movable assets. They purchased these assets purposefully because in the desolation caused by riverbank erosion they have been supported by these assets. They purchased land in Sehala and Kaloni for resettling their habitat after displacement. This type of investment is nothing but their precautionary measure to adopt to the changing environment.

More than 83 percent displacees of Sehala and more than 70 percent of Kaloni purchased land for resettlement in Sehala and Kaloni respectively. The rest of them resettled on khasland or on the land owned by others in Sehala and Kaloni. The strategy of purchasing land in Sehala and Kaloni prior to their displacement played an effective and prompt role in the process of environmental adaptation. In the catastrophic situation caused by riverbank erosion, they migrated to Sehala and Kaloni. It is a purposeful strategy. It is found that 2.78 percent displacees of Sehala and more than 40 percent of them from Kaloni invested capital in purchasing livestock. The shift of dismantled materials and other goods were operated by the livestock. It has also been found that 2.78 percent displacees from Sehala and 69.23 percent of Kaloni purchased other movable assets, which have resalable and reusable values.

The variable of displacement status indicates that he preponderant majority of once, twice, thrice, and more than thrice displacees of both

villages incidentally invested their capital in purchasing land. This incidental strategy is followed by another purposeful strategy of purchasing movable assets. The correlation is significant at 0.9826 level for Sehala and at 0.2982 for Kaloni.

Stay in the Place of Shelter

The displacees of Sehala and Kaloni were on the riparian tracts of the Padma and of the Mahananda. The catastrophic attack of riverbank erosion engulfed their houses and homestead plots. They were rendered distress and cmplelled to find shelter either temporary or long-term. A radical change has been occurred in the course of their life and settlement due to riverbank erosion. The displacees of Sehala and Kaloni found shelter on the flood-protecting embankment, on neighbor's land, on khasland, beside the roads and highways, and under the shed of kin or neighbors.

It is noticeable that 5.56 percent displacees of Sehala and nearly 80 percent of Kaloni were sheltered on the BWDB embankment (Figure-9). They rebuilt their small hut on both side of the embankment and took shelter in squatting dwelling situation. They were suffered from the lack of drinking water, sanitation facilities, and emergency health care service. The following proportion of them took shelter beside the road. They were 16.67 percent displacees of Sehala and 10.58 percent of Kaloni. They were also compelled to confront with what their counterparts on the embankment faced up to. Two small proportions of the displacees were sheltered under their kin's shed and on their neighbor's land. They were 38.89 percent each from Sehala and 3.85 percent respectively. They were also supported by their kins or neighbors in having drinking water and sanitation facilities to some extent. They reported that they were in the places of shelter for a period of three months at lower limit and of one year at the higher limit. After this period, they left these places and migrated to Sehala and Kaloni for developing their settlement.

Clustered Settlement Pattern

After the displacement due to riverbank erosion, most of the displacees have migrated to Sehala and Kaloni from their places of temporary shelter. They started to settle themselves in Sehala and Kaloni closely together. They form a cluster and/or contiguous selltement in the study villages. They were also clustered into a major squatting on the flood-protecting embankment (cf. Zaman 1986b).

The western part of Kaloni was a mango-orchard. It was deserted due to their clustered settlement. Their settlement in a cluster and contiguous pattern is a corrective type of strategy for adapting to a new social environment. This is an incidental measure of reducing hazard loss due to riverbank erosion. The clustered settlement pattern builds a bridge between the displacees settled in Sehala and Kaloni.

Concluding Remarks

The loss reducing mechanisms of the riverbank erosion displacees of two northern Bangladeshi villages show a sheer corrective type in their nature. It is because that the devoid of administrative and institutional support and the low level their socioeconomic and technological capacity as well failed to prevent the attack of riverbank erosion and consequent massive loss. This adverse and critical situation intimidates them to design and undertake corrective rather than preventive measures for trimming down their loss.

The displacees of Sehala and Kaloni embark on selling the title of their eroded land, taking to pieces of housing structure, and cutting trees in order to shrink their loss. Also they transfer their livestock, tangible goods and budging the family members from erasing threatened homestead plot to safer places. In the same way, an ample section of them prayed Almighty Allah in addition. It is because that they have spiritual belief on Him and in fact, the prevention of erosion went out of their control as they have no adequate large-scale engineering technology and socio-economic capacity. As a matter of fact, they are compelled to desert their riparian homestead plots and are migrate to safer places. This is nothing but a negative acceptance of their loss.

Policy Recommendations

The policy implications claimed by the research findings prefigure that he government and non-government organizations should respond to the prodigious needs of riverbank erosion displacees. This response should be made in the immediacy of erosion attack for aiding them in their environmental adaptation on the hazardous riparian tract. The research findings set down some recommendations for future planning which are coming next after.

1. The government should undertake large-scale engineering works and allocate financial cost for preventing the riverbank erosion.

2. In the immediateness of erosion, the displacees need to be sheltered at any cost. The government should provide them with adequate assistance of shelter.

3. The displacees have to grapple with food crisis and thus the emergency food ration may lessen their sufferings. They expect that the food ration should be pressed into service by the government in onslaught of riverbank erosion.

4. The displacees are subject to health hazard and its ultimate result is epidemic. The government should provide them with health care and low-cost house with sanitary latrine and arsenic-free drinking water facilities. This assistance will aid them in adapting to their hazardous riverine environment.

5. The homestead plot, housing materials and financial support are crucial to their resettlement. They receive skimpy financial assistance from their neighbors and/or kins but from any institutional sources. They expect that the government and non-government organizations should do this job in time.

6. The displacees look forward to their employment by the government and non-government organizations in non-agricultural sector for their survival.

Endnotes

[1] The riverbank erosion displacees are those who are displaced from their riparian homestead plots due to riverbank erosion at least once. The shifting of major rivers of Bangladesh and their unstable character cause this environmental disaster. Consequently, thousands of people are compelled to leave the erosion-threatened areas every year. Riverbank erosion renders people homeless and helpless offering them a desolate state of livelihood. The displacees are categorized as 'displaced once,' 'displaced twice,' 'displaced thrice,' and 'displaced more than thrice.'

[2] A geographically defined land revenue unit. The land revenue survey undertaken by the government of British India coined the term mauza for revenue purposes. Mauza was the unit of this survey. This was defined in the note of directions for settlement Officers, 1849 as a parcel of land which had a separte name in the revenue records, i.e., practically a local subdivision of an estate or mahal (Nelson 1923; Wilson 1855).

[3] It is a higher tier of the local government administration in Bangladesh. It has been positioned in third step of administration, i.e., Division,

District, and then Thana. It comprises two or more unions and district is consisted of two or more thanas.

4 A mid-channel islet in the riverbed. It is any accretion in the river which may be seasonal or may survive for several decades. Charlands are abundantly found in the large rivers of Bangladesh, such as the Padma. The intense competition among floodplain inhabitants to cultivate these charlands and/or to settle on it creates social clash in terrible form. These lands were regulated in the British India by Bengal Regulations XI, 1825 (Wilson 1855).

5 A tract called varendra in the Sanskrit literature, which means a part of Bengal north of the Ganges/the Padma, designating especially one great division of the Brahmans of Bangal (Wilson 1855). This tract is one of the terrace areas of Pleistocene age within the Bengal Basin. It has two terrace levels—one at 39.7m and the other between 19.8m and 22.9m (Rashid 1977). It is divided into five sections, viz., North-Eastern outlier, Eastern Barind, East-Central Barind, West-Central Barind. The district of Nawabganj includes parts of the West-Central Barind and of the Western Barind.

6 Bangladesh Water Development Board.

7 Khas is an Arabic term used to mean select, eminent, noble and also private, peculiar, etc. (Wilson 1855). Khas as a revenue term is applied to lands held by Zamindars and cultivated by themselves for their own benefit (Wilson 1855) The term of khasland is considered by the present study as unused land owned by the government.

8 It is an indigenous village social organization. It is not organized by the government. It is a village council which may be compared with parea of Punjabi village in Pakistan (Eglar 1960). Samaj performs religious, ritual, ceremonial, and adjudicative functions (for more, see Karim 1990).

In-text Citations

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics)

1981 *1981 Statistical Yearbook of Bangladesh. Dhaka:BBS.*

1982b *Statistical Pocket Book of Bangladesh 1981. Dhaka:BBS.*

Currey, Bruce

1979 *Mapping Areas Liable to Famine in Bangladesh (mimeo). Ph.d. Dissertation, University of Hawaii, USA.*

Eglar, Zekiye

1960 *A Punjabi Village in Pakistan. New York: Columbia University Press.*

Elahi, K. M. and John R. Rogge

1990 *Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh: A Report on the Riverbank Erosion Impact Study. Dhaka: Riverbank Erosion Impact Study (REIS), Jahangirnagar University (JU).*

FAO

1989 *Selected Policy Issues and Working Papers. Dhaka: FAO/UNDP/GOB, Agricultural Mission.*

GPRB (Government of the People's Republic of Bangladesh)

1980 *The Second Five Year Plan (1980-85). Dhaka: Planning Commission.*

1992 *Achieving the Goals for Children and Development for the 1900's. Dhaka: Planning Commission.*

Haque, C. E.

1992 *Human Responses to Riverbank Erosion Hazard in Bangladesh: Some Lessons from Indigenous Adjustment strategies. In K.M. Elahi, K.S. Ahmed and M. Mafizuddin (eds.), Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh, Dhaka: REIS, JU.*

Hossain, M.M.

1919 *Shifting Characteristics of the Ganges in Bangladesh. In K.M. Elahi, K.S. Ahmend, and M. Mafizuddin (eds.), Riverbank*

Erosion, and Population Displacement in Bangladesh. Dhaka: REIS, JU.

Islam, M.A.
1974 *Tropical Cyclones : Coastal Bangladesh. In Gilbert F. White (ed.), Natural Hazards: Local, National, Global. New York: Oxford University Press.*

Kalam, M.A. and M.A. Jabbar
1991 *River Course Monitoring of the Ganges at Godagari, Rajshahi Using Remote Sensing Techniques. In K.M. Elahi, K.S. Ahmed, and M. Mafizuddidn (eds.), Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement. Dhaka: REIS, JU.*

Karim, A.H.M. Zehadul
1990 *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society: A Case Study of the Changing Power structure in Bangladesh. New Delhi: Northern Book Centre.*

Nazem, N.I. and K.M. Elahi
1990 *Impact of Riverbank Erosion on Land Settlements in Bangladesh. In A.Q.M. Mahbub (ed.), Proceedings of the Seminar on People and Environment in Bangladesh. Dhaka: UNDP and UNFPA.*

Nelson, W. H.
1923 *Final Report of the Survey and Settlement Operations in the District of Rajshahi, 1912-12922. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot.*

Rashid, H.
1976 *Geography of Bangladesh, 2nd revised edition 1991. Dhaka: University Press Limited.*

Rogge, John R.
1991 *Individual and Institutional Responses to Riverbank Erosion Hazards. In K.M. Elahi, K.S. Ahmed, and M. Mafizuddin (eds.), Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh. Dhaka: REIS, JU.*

Tarrant, J.R.
1982 *Food Policy Confects in Bangladesh, world Development, Vol. 10 # 2.*

White, Gilbert F. (ed.)
1974 *Natural Hazard : Local, National, Global. New York : Oxford University Press.*

Wilson, H. H.
1855 *A Glossary of Judicial and Revenue Terms, and of Useful Words Occurring in Official Documents Relating to the Administration of the Government of British India, from the Arabic, Persian, Hindustani, Sanskrit, Hindi, Bengali, Uriya, Guzarathi, Telegu, Karnata, Tamil, Malayalam, and Other Languages. London : W. M. H. Allen and Co.*

Zaman, M. Q.
1987 *Endemic Land Conflict and Violence in Char Villages of Bangladesh, REIS Newsletter, # 3, pp. 8-11. Also in V. S. Pendakur and U. P. Dwivedi (eds.), South Asia Horizons, Canadian Association of Asian Studies, University of Montreal, 5 :50-57.*

ISSN-1605-2021

Lok Proshason Samoeeky
Vol. 23
June-2002/Joishtho-1409

Cadastre Information System : An Urgent Need in Bangladesh

Byomkesh Talukder*

Abstract : Cadastre is the fundamental tool for land records. It contains the parcel boundaries and the surface and the parcel co-ordinations. It is the key to information on land. Generally, the cadastre system is the basis used for the protection of the property by means of title registration and cadastral plans. The cadastre system of Bangladesh is old. Therefore, it is facing continuous problems. But nowadays the cadastre has improved a lot. The digital cadastre is solving many land-related problems. The digital cadastre can store database of each parcel which can be used in civil engineering, soil survey, hydrological modelling, land resource management, market analysis, sustainable development and in urban planning. It has been proved excellent tools for spatial planning. Bangladesh Government is trying to bring its land management under computerized cadastre system. Hence, cadastre is very much needed for Bangladesh.

Introduction:

Land is the ultimate resource, for without it life on earth cannot be sustained. Land both a physical commodity and an abstract concept in that the rights to own or use it are as much a part of the land as the objects rooted in its soil. Good stewardship of the land is essential for present and future. The role of land in the economy of each nation is not always obvious, but is of great significance. Without secure land rights there can be no sustainable development, for there will be little willingness to make long-term investments. There is a need to manage the wealth of every nation; at least 20% of whose gross domestic product (GDP) can come from land, property and construction. All countries need to determine the ownership and value of land and property, and to monitor and manage their use so that the value of these assets may be enhanced.

The ownership, value and use of land, although independent in concept, are interdependent in practice. Each attribute of land needs to be carefully managed to achieve this there must be good land record: of ownership to ensure security of tenure; of value to ensure fairness in land and property taxation and equity in the compulsory acquisition of land for state purpose; and of the use of land to ensure effective resource management. This information can be obtained from the cadastre system. A cadastre is similar to a land register in that it contains a set of records about land.

* Evaluation officer, BPATC, Savar, Dhaka.

Cadastres are based either on the property land parcel, which is the area defined by ownership; or on the taxable area of land which may be different from the extent of what is owned; or an area defined by land use rather than by land ownership, Cadastres may support either records of property rights, or the taxation of land, or the recording of land use. Cadastres may also be used in a multi-purpose role to provide a wide range of land related information. In such cases, it is best if they are constructed around the proprietary land parcel, as this is the legal basis for all dealings in land. Where ownership has not yet been proved, as may be the case where the land is being restored to former owners, such multi purpose records can be built around the land parcel as defined by rights of use.

The cadastre is an information system consisting of two parts: a series of maps or plans showing the size and location of all land parcels together with text records that describe the attributes of the land. It is distinguished from a land registration system in that the latter is exclusively concerned with ownership. Different countries interpret the term "cadastre" in different ways and this can lead to great confusion when analyzing systems. The common understanding is that a cadastre is a from of land information system. The term "land information system" is applied to a wide range of spatial information, including environmental and socio-economic data as well as data related to infrastructure systems and the cadastre. A land information system is not necessarily land parcel - based, unlike a juridical, fiscal or multi-purpose cadastre. Instead, it may be an inventory of forest resources, or of soils, or of geology and may incorporate a variety of types of data. A cadastre is more specifically focused on the ownership, value or use of land parcels.

In Bangladesh cadastre incorporates land registration and cadastre survey. The land registration deals with establishing lists of owners and all their properties. The information that cadastral stores for each property are: the name, the date of birth and the address of land owner, the description of the location of the property, the number its parcels, the size and area of each parcel, the district where the property is located, additional information about the property like title number, name of cadastral agency, the nature of ground use and all the rights and restrictions.

The cadastre survey, on the other hand, serves as a way furnishing the geometric description of each parcel. It consists of determining the parcel

boundaries, the surface and the parcel co-ordinations. This spatial structure is usually stored in an analog cadastral map.

Generally, the cadastre system is the basis used for the protection of the property by means of title registration and cadastre plans. Each parcel and its owners are registered and all the spatial structures consisting of location, boundaries and contents are described in a cadastre map. Therefore, the cadastre system is seen as a land information system affording information on real estate of a property. It improves the land management whether in urban or rural areas. In urban areas, it is becoming a fundamental framework for planning, assessment and collection of rates and taxes. In rural areas, the claim to ownership increases the investment in agricultural lands and the property business. For its unique power an appropriate cadastral system should be designed and established by and for a particular country. That is why cadastral system is very much essential for Bangladesh. The cadastre system can be established for fiscal purposes, for protection of property rights or for a multi purpose system.

Cadastre Data :

Data that may be appear in a cadastre include: geometric data (coordinates, maps); property addresses; land use; real property information; the nature and duration of the tenure; details about the construction of buildings and apartments; populations; land taxation values. Data may relate to single plots of land or may cover many properties, as in land - use zoning. The data may be used to support private land transactions, to support land markets, or to assist in the administration of diverse sections of the economy such as: agriculture, environment protection, fishing; forestry; housing; land-use management and zoning; public utilities; transport etc.

Customers of Cadastre Data :

The customers of a cadastre information system include most government departments and many sectors of the community, for instance:

(a) ***Government :*** agriculture and forestry; defense education; environment; finance/economic affairs; health; highway and transport; housing; internal affairs/police; justice; lands and surveys; local government; natural resources; planning and development; power and electricity; public works; trade and industry; etc.;

(b) ***Private sector :*** architects; banks and building societies; construction companies; economists; engineers; environmentalists; farmers and foresters; financial and insurance adviser; investors; land and property owners; lawyers and notaries; marketing specialists; planners; property developers; property managers; real- estate agents; surveyors and valuers; etc.

Cadastre Survey/System Exist in Bangladesh :

The cadastre mapping system in Bangladesh is roughly 2000 years old. In our sub-continent the cadastre survey was introduced over a long period of time-from 1540 to 1875. The Great Triangulation Survey, The invention of the "Theodolite', the mapping of Sutanoti an appearance of the legendary James Renal as the Surveyor General of India are the landmark in the history of survey in this region. Till today, the same system is being employed for survey purpose, except the 'Technical Rules and Instructions of 1957 are also followed. A survey called the Traverse Survey seeks to prepare a skeleton plan of a village showing its exact relative position on also shown on a piece of paper called the P-70 Sheet. Plots of a mouza map are drawn through various stages (Figure 1.1) such as Khaka preparation, morabba Cutting, drawing of Shikmi Lines, Kistwar of Plots, etc.

Constraints of the Present Cadastre in Bangladesh :

In a developing country like Bangladesh, cadastre systems are out of date and inaccurate. The significant problems of these aspects in the existing cadastres are: Storing cadastral unit attributes and map data in different systems, low precision of geometric data, the hardness of the analog form of cadastre surveying with paper, the slowness of updating, retrieval and storage process in the conventional system, the disability for performing analysis and report in an easy way. There are many constraints and drawbacks in preparing a cadastre map in the present situation in Bangladesh. These are:

* *The present cadastre map preparation system is obsolete and cannot meet the needs of the age*
* *The system is manual and there is every possibility of errors.*
* *Preparation and reproduction of cadastre map is very time consuming*
* *The Cadastre map is not equally acceptable to its different kinds of users.*

- *It is difficult to use in development activities*
- *Present cadastre maps are not adequately informative*
- *The survey instruments are not available and they are also faulty and full of errors.*

From the above scenario it can easily be presumed that this is the high time to look at the whole system of Cadastre Map Preparation with a modern view and vision. New ideas and technologies are coming up almost every day. Globalization is also playing a vital role for spreading every knowledge. So, we should look forward for digital cadastre.

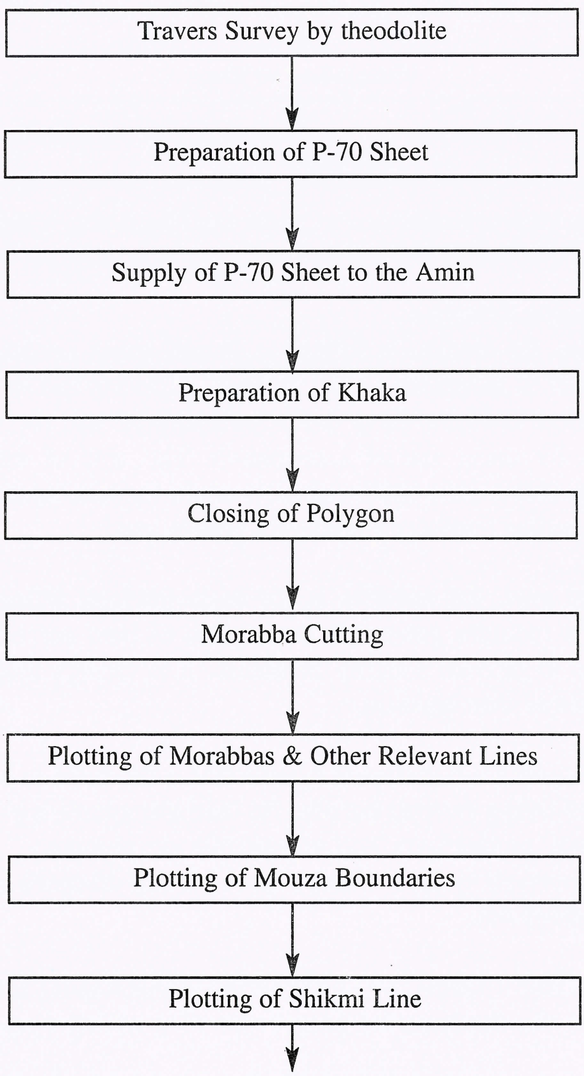

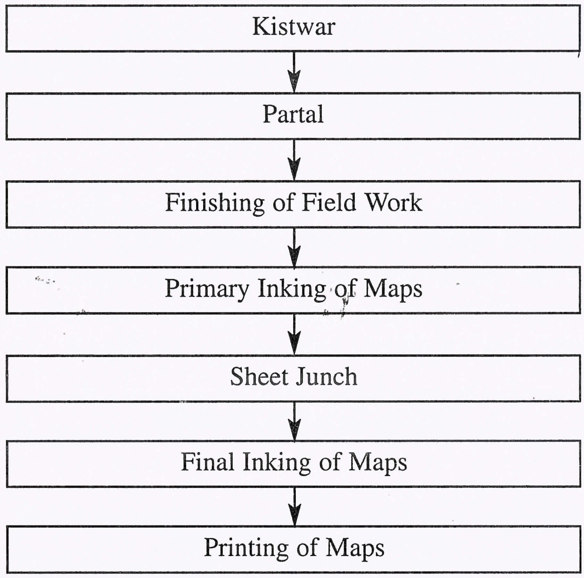

Figure 1.1: Present Steps of Preparation of a Cadastre Map (Mouza Map) in Bangladesh
Source: DLR & S, Dhaka, Bangladesh, 2001.

Digital Cadastre System :

In the first case, the cadastre is defined as general public inventory of land objects in order to assess the values of land properties and to order land taxation. Digital Cadastral Map has a multipurpose use for sustainable development by using spatial information. The aim of this kind of cadastre is to obtain information about owners (names, addresses, etc.) and their properties (surface, boundaries, tenure, etc.).

In the second case, the cadastre is the basis for land titling and land registration. It includes geometric description of land parcels and land register so as to provide security of tenure. It is closely linked to title registration rather than taxation.

The last case consists of cadastral system that is the basis to support not only fiscal and titling systems but also the land management and markets, the agricultural productivity and sustainable development. This kind, called a multipurpose system, must be appropriately designed to serve the needs of development.

Each kind of these systems can be applied to modernize the management of land. Then the fundamental component of a multipurpose cadastre

information system based on digital cadastre map will be well constructed. The role of this system is to enhance the managing and controlling the land resources with a focus on sustainable development. The advent of computer technology is the principal tool that has modernized the existing cadastral systems. The effects of their sophistication are observed along many sectors of the societies. However, existing cadastre in Bangladesh is still inefficient, so the government of need to improve them.

Benefits of Digital Cadastre System :

The modern cadastre is not primarily concerned with generalized data rather with detailed information at the individual land parcel level. As such it should service the needs both of the individual and of the community at large. Benefits arise through its application to: *asset management; conveyancing; credit security; demographic analysis; development control; emergency planning and management; environmental impact assessment; housing transaction and land market analysis; land and property owner-ship; land and property taxation; land reform; monitoring statistical data; physical planning; property portfolio management; public communication; site location; site management and protection.* Although digital cadastre is expensive to compile and to keep up to date, a good cadastre system should produce benefits, many of which cannot in practice be quantified in cash terms.

Now all the developed countries are using digital cadastral system for managing their land administration. They are doing so as it covers all activities concerned with the management of land as a resource both from an environmental and from an economic perspective. Using of digital cadastral system can enhance the following benefits.

* Force standardization in the collection and processing of land information;
* Speed up the processes of first registration of the title;
* Decrease the cost and space required for storing land record;
* Prevent unnecessary duplication;
* Simplify the preparation of "disaster" copies of registration;
* Facilitate access to land-related data and improve their distribution;
* Reduce the time and cost involved in transfering property rights and in processing mortgages;

* Provide spatial data (data may be of all types of land related information) for spatial planning;
* Facilitate the monitoring and analysis of market and rental values of land and property; and
* Provide built-in mechanisms for quality control.

Computerized Cadastre Map Production :

Presently two types of land survey and mapping system are being followed all over the World—one is the Total Station and the other is Aerial Photography. Another type of mapping system is digitizing. These are mainly the ways of capturing spatial data. We can—

* Digitize data from previous/old maps; or
* Collect digital data from aerial photography; or
* Collect spatial data directly from field by Total Station (Theodolite with EDM).

A diagram (Figure 1.2) is given here for production of a printed cadastre map from captured and spatial data. This process is less time consuming and less expensive. Many layered for multifarious use can be produced easily by this system. Maps can be supplied within a few hours.

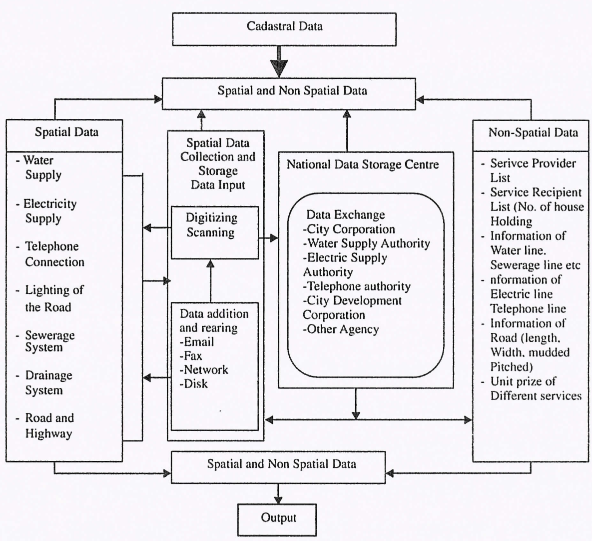

Figure 1.2 Steps of the Computerize Cadastre Map Production
Source: DLR & S, Dhaka, Bangladesh, 2001.

Importance of Digital Cadastre in Bangladesh :

Land is considered the most valuable wealth. This wealth can contribute a lot to our economic growth. The development of a country depends; to a great extent, on effective land use planning. As our country is most thickly populated, we need to use our land resources at its optimum by planning each and every parcel of land. Otherwise we shall face a great difficulty to grow sufficient food for our people, to develop our infrastructures and all other development activities. To have a good land use plan, it is essential to have a good land survey i.e. a good map. Preparation of good, elaborate and informative map is not an easy task. The sizes of our land parcels are very small. These small plots are again being divided into several plots because of our existing " Law of Inheritance". There is a saying that the total area of our plot boundaries (Ailes) is equal to one-third of the arable land of our country. This information gives a poor picture of our land system. Therefore, it is high time to give priority and proper importance to having a detailed and informative map of each village or Mouza of Bangladesh.

Probable Sectors of Use of Digital Cadastre Data in Bangladesh :

The principal element of any modern cadastre is the digital cadastral map, for it is a large view of a geographic area and it can be displayed and printed at different scales. Its major advantage is to display the spatial relationships between land objects. It is obviously organized into layers or themes giving information about properties, buildings, land use and population. Therefore, it is a tool to describe the location, the shape and the contents of each object. Now the spatial and non-spatial data can be projected on the cadastral map. This linkage is very important to process, to analyze land situation and to make decision. For that reason, it is necessary to develop a system that allows the storing and processing operations in the same geographic database. For example, a layer containing social information is required to be linked to the object indicating the concerned areas with the social information. Hence, the digital cadastral map can be divided into two levels: Digital data modelling and Object-based representation.

The digital data modelling (DTM) is usually used as an elevation model that combines many elevation data into a data structure. DTM will be a principal source of collecting data such as studying soil erosion and environmental impact. The DTM helps scientists to extract slop values (gradient, aspect, profile convexity and plan convexity) and terrain features related to surface hydrology such as drainage channels, topology

of channel network and descriptive information. The object-based representation (OBR) involves the association of attribute data with objects and the suitable relationship among objects having spatial and non-spatial information. The spatial objects can be property parcels, administrative districts, and plant zoning and civil networks. Digital cadastre map in incorporated with GIS can be used in Cadastre map production, Soil survey, Civil engineering, Hydrological modelling, Sustainable development, Market analysis, Land resource management, Object based presentation and Digital terrain modelling.

Cadastre Data Use in Civil Engineering :

Civil engineering activities that include road design, site planning of dams and open cast mining require DTM in order to accomplish the visibility analysis, the relief shadow analysis, the profile computation and the volumetric computation. All these activities include a set of data that can perform operations on digital cadastral map. Examples of such operations include combining layers to form new sites, classifying zones and choosing the appropriate site for civil projects. These projects refer to municipal planning and management activities such as school, political district, traffic analysis and managing of public facilities. This means that the government must use the digital cadastral map in order to find all aspects of legal situation of a piece of land, though it seems to be expensive. The use of cadastral system in civil engineering will be very much effective for Bangladesh.

Soil Survey :

The digital cadastral map also serves the purpose of gathering soil data for performing studies on experimental agricultural farms. The soil data survey includes qualitative description such as texture class, color, geological formation, and legal information about every piece of land and landowner. They, in addition, include quantitative description such as porosity, thickness, soil profiles, and the surface of the area studied. This can be used for agricultural planning in Bangladesh.

Hydrological Modelling :

The hydrological modelling is used to study water resource management and pollution control. It starts with studying the discharge of rainwater, ground water discharge, storage, filtration and evaporation. The data obtained from DTM and soil survey overlaid with cadastral layer and legal information in a digital cadastral map enable us to determine new aspects of land uses. This can be very effective in respect of Bangladesh.

Land Resource Management :

Bangladesh is experiencing progressive imbalance of man land ratio and it is a constant threat. Population pressure on the rural homestead increase has already reached the saturation level. Urban sprints and expansion of unplanned settlement engulfs agriculture or forest acreage. The result being a super chaotic uneconomic land use pattern. Land is a limited resource and for Bangladesh it is very scarce. Land is the most fundamental of natural resources. Its particular use and management affect:-

* The quantity and quality of production and employment associated with land both directly and indirectly.
* The degree of pollution/degradation of not only land but also water and air
* The integrity of the biological systems upon which human life depends
* The preservation of open space and
* The customs, character and way of life of communication and individuals.

When one deals with the land matter he has to address everybody who has landed property. Improper dealing with the matters relating to land creates lots of social and economic problems. For a better land survey system transparency and accountability should be ensured. To address the issue of proper reforms of land survey system through a modern technology is required because modernizing the land record system through computerized will give transparency and accountability.

Proper land management is a pre-requisite for overall development in a developing country like Bangladesh. Like many other things we have inherited the system from the British colonial administration. Much has been said about the modernization of land management system in Bangladesh but hardly anything tangible has been done. A modern land information system will surely lead to a better and more effective land administration management in Bangladesh.

For proper land management of Bangladesh digital cadastral map with integrating natural resources is very essential. The result consists of attribute data such as land ownership and graphical data such as roads, building or public institutions that are linked through unique identifiers assigned to spatial units such as land parcels. Then the cadastral map facilitates in a systematic manner the collection and storage of data

related to land resources. It defines where dangers can be caused by natural phenomena and where certain managements are permitted or forbidden. The aim is to regulate land use and environment protection and construction laws. By the use of cadastral system the following major themes of land management in Bangladesh context can be archived:

* Processes relating to change in land titles, such as land records preparation and updating, land transfer registration, land mutation, etc.

* Land based dispute adjudication/resolution.

* Management of state land and water resources consisting of distributable/leaseable resources, such as agriculture and non-agriculture land, water bodies, hatts and bazar, minor minerals etc. and non-distribution/non-leasable common property resource such as grazing land, forestland pathway, open water bodies etc.

* Government intervention in land use through regulation, direct participation, taxation, consolidation and acquisition for development purpose.

* Land revenue/Tax and other sources of land-based revenues.

* Land management organizational set-up and its vertical and horizontal linkages and

* People's participation in land management, particularly through the involvement of NGOs, peasant association, local government bodies etc.

Market Analysis

Marketing leads with determining potential customers, reaching customers and maximizing sales through distribution channels (Beaumont, 1991). The important need of a digital cadastral map in market analysis is derived from the dynamic nature of the demand and supply of products and services. In digital cadastral maps, are located buildings, areas and owners, thus cadastral system can forecast various locations for competing stores, pricing and product performances of customers. On the other hand, the customary rights can be documented on a digital cadastral map because it documents all aspects of land.

Sustainable Development

The principal objects of a digital cadastral map are property parcels, resource polygons, road and utility networks, topographic data, and census and electoral polygons. Then the creation, retrieval, and maintenance of these spatial objects are the fundamental to modern cadastral information system. The types of spatial objects that require maintenance of location, spatial extent, and attribute data such as ownership and land parcels. Therefore, integrity of data should be maintained at every time an update is performed. If the size of a land parcel is changed, it would be necessary to change all attribute data that are affected by this change. The digital cadastral map enables users to issue data retrieval as well as requests visually because it permits a systematic way to store and to retrieve multiple values for the attribute data for a specific land parcel.

Urban Planning

Digital cadastral map can be used in Urban Planning in cooperation with GIS. The development of GIS is increased gradually. The importance of GIS increased in the field of land management and natural resource management. Recently in our country the use of GIS/LIS (Land Information System) has introduced. Every country in this competitive world wants to achieve development and for this development proper planning is necessary. For the prosperity of a country there need coordination between planning and development. For a sustainable and durable urban development and planning development digital cadastral map and GIS can be a dependable tool. The following figure 1.3 illustrates the usage of GIS for LIS and the figure 1.4 illustrates how cadastral data and GIS can be used for urban planning.

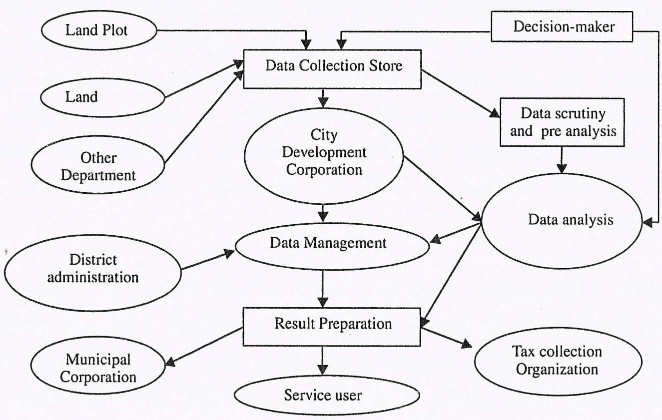

Figure 1.3: The use of LIS and GIS for Urban Management and Planning
Source: Karim, Raziul Md., Geographic Information System, 1998, Dhaka, Page -18.

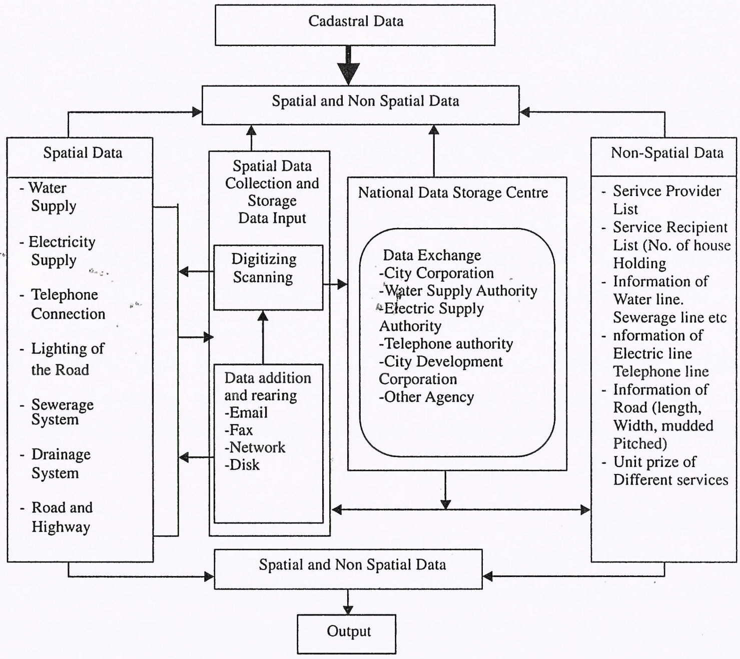

Figure 1.4: Use of Digital Cadastral map GIS in Urban Planning
Source: Karim, Raziul Md., Geographic Information System, 1998, Dhaka, Page -19.

Conclusion :

Recently, the government of Bangladesh has become increasingly aware of deficiencies in cadastral systems. It wants to take advantage of the new technology based on computerized information system in order to enhance the manner of working and to upgrade the skills of personnel.

The Cadastral Information System can collect, process, analyze and edit the spatial information. It improves the management of natural resources and promotes an efficient production in sustainable manner. The major effect of this new system is the protection of land use rights and the establishment of security of tenure for users. For this, the fundamental elements for the expansion will be cadastral mapping and cadastral registration.

A Cadastre Information System (CIS), which based on digital cadastre map, can produce map and map data on cadastre unit are stored in the same database. The CIS supports not only the cadastral mapping or the land surveying and titling but also a variety of purposes such as identifying specific areas, determining limits of different status of land,

sustainable development, social stability, land management and agricultural studies. The traditional cadastral system that is being used still in Bangladesh has the following limitations: It rarely delivers the solutions that managers want; it requires specialized personnel for analysis, design, programming, testing and it's very difficult to execute as described, and it's taking too long time for maintaining

The digital cadastre can reduce the barriers of the present cadastre system of Bangladesh. Compared with existing cadastre systems, the cadastre information system based on digital cadastre maps gives an overview of its uses and solutions. The CIS can be expanded to serve the purpose of sustainable development. Under these assumptions, the government of Bangladesh may conduct various projects related to land planning and management. The CIS is the safe manner to integrate all projects in a same system. This has the advantage of being easily designed and implemented and incorporating the existing data because the model data will be formulated in a digital format.

References :

Adam Nabil R., and Gangopadhyay A., 2000, database issues in geographic information systems, series Editor: A.K.Elmagarmid, Kluwer academic publishers, USA.

Beaumont J.R., GIS and Market analysis, In Maguire, D.J., Goodchild, M., and Rhind.

D.W., Editors, Geographical information systems: Principles and applications, Vol.2,pp. 139-151, Longman scientific and technical, NewYork.

Hendrix steven E., and Logan Ronald A., 1996, Cadastral and property registry modernisation: Ideas on public-private partnerships, GEOMATICA, Vol. 50, No. 1, pp.59-63, Canada.

Kaufman J., and Steudler D., 1998, cadastre 2014: a vision for a future cadastral system, working group1, FIG commission 7, FIG.

Taylor David A., 1992, Object-Oriented Information systems: planning and implementation, John Wiley & Sons, Inc., USA.

Williamson I., 1997, The justification of cadastral systems in developing country, GEOMATICA, Vol.51, No.1, pp.21-36, Canada.

লোক-প্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্নাল। প্রতি ইংরেজি বছরের মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক-প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

- লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে । মূল পান্ডুলিপির সংগে অবশ্যাই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটারে কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবে ঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয় সুতন্নি" ফন্ট ইংরেজি কম্পোজ ঃ 'টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিসকেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- মূল কপিসহ পান্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিছন্ন কপি) সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভার পেজে) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম,খন্ড ও ইসু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা ইত্যাদি প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।

- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।

- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিসকেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (২৫০ থেকে ৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য সম্মানী থেকে এক-তৃতীয়াংশ কর্তন করা হবে।